5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

POLITICAL SCIENCE

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

5 YEAR QUESTIONS
WITH
SAMPLE ANSWERS

POLITICAL SCIENCE

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

Published by :

West Bengal Council of Higher Secondary Education

Published on :

October, 2020

Printed By :

Saraswaty Press Limited

(Government of West Bengal Enterprise)

Price : Rs. 40.00 only

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২ ব্লক ডি.জে. সেক্টর-২ সল্টলেক সিটি

কলকাতা-৭০০০৯১

নং ঃ L / PR / 156 / 2020 তারিখ ঃ 10.10.2020

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে এবং সংসদের অ্যাকাডেমিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই প্রথম ২০১৫-২০১৯ এই পাঁচ বছরের ইংরেজী, সংস্কৃত, নিউট্রিশন, এডুকেশন, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি এবং সোসিওলজি এই ৯টি বিষয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের বই প্রকাশ করা হলো।

বর্তমান বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পঠন-পাঠনের অসুবিধে এবং ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চাহিদা বিবেচনা করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে সংসদের এই উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে সংসদ বর্তমান সিলেবাসের Sample Question সহ Question Pattern, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'Concepts with Sample Question and Solution' এবং Mock Test Papers প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের আশা এই বইগুলির মাধ্যমে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হবে।

মহুয়া দাস
সভাপতি
পঃ বঃ উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদ

সূচিপত্র

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

POLITICAL SCIENCE

Year	Page No.
2015 (Part-A & Part-B)	1-22
2016 (Part-A & Part-B)	23-46
2017 (Part-A & Part-B)	47-68
2018 (Part-A & Part-B)	69-87
2019 (Part-A & Part-B)	88-98

Political Science

2015

(10 Marks)

(1) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝ? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পাথর্ক্য কী?

উঃ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান সেইরকম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু কোনো রাষ্ট্রই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই সব রাষ্ট্রকে তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। রাষ্ট্রগুলি তার পররাষ্ট্রনীতি এভাবেই গড়ে তোলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এই পারস্পারিক সম্পর্ককেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে।

হার্টম্যানের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল এমন একটি বিষয় যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

কে.জে. হলস্টির মতে, সাধারণভাবে নিয়মিত প্রক্রিয়া অনুসারে পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল স্বাধীন রাজনৈতিক শর্তাবলীকে নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনাকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে।

পামার ও পারকিনস্ বলেছেন, বিশ্বের সব মানুষ ও গোষ্ঠীর যাবতীয় সম্পর্ক, মানুষ্যজীবন, তাদের কার্যকলাপ ও চিন্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, চাপ ও প্রক্রিয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করে। তাঁরা রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলির উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এইরূপ হতে পারে ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল এমন একটি বিষয়, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতা রাজনৈতিক মতাদর্শ, যুদ্ধ ও শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সংগঠন, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত, প্রচার, কূটনীতি, বিশ্ববাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ, বিশ্ব-পরিবেশ প্রভৃতির মতো প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

পার্থক্য ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে সেগুলি হল ঃ

(1) **পরিধিগত পার্থক্য ঃ** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা ক্ষেত্রের বিষয় বহুবিধ ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশ বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়; যেমন– রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়গুলিও আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া অ-রাজনৈতিক

বিষয়গুলিও আলোচ্য সূচীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। পামার ও পরিকিনস্-এর মতে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেক বেশি বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক উভয় বিষয় নিয়েই আলোচনা করে।

হলস্টির অভিমত হল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পররাষ্ট্র থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক নীতিবোধ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক পর্যটন ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য নানারকম উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচীর বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে নিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করে।

সি.এফ. অলজার আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি উপ-আলোচনাক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

(2) **বিষয়বস্তুগত পার্থক্য** ঃ- বাস্তববাদী তাত্ত্বিক মর্গেনথাউ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে মুখ্যত ক্ষমতার লড়াই হিসাবে বোঝাতে চেয়েছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রধানত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতাকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ ও সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করে থাকে। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাক্ষেত্র হল সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা, শত্রুতা ও মিত্রতা, সংঘর্ষ-সমন্বয় ইত্যাদি। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কোন্ দিকগুলোর আলোচনা করা হবে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই বলা যায়– আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু তুলনামূলকভাবে গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত।

(3) **দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য** ঃ- কে. জে. হলস্টির মতানুযায়ী, আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় মুখ্যত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতার উৎস ও উপাদান, পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাজকর্ম ইত্যাদির ওপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, যোগাযোগব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি শাখা বা অংশ বলে বিবেচিত হলেও এই অংশটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মুখ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

অথবা

বিশ্বায়নের প্রকৃতি আলোচনা করো।

উ: বিশ্বায়ন একটি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া। জোসেফ স্টিগলিৎস্-এর মতে, বিশ্বায়ন বলতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্য এক নিবিড় সংযোগসাধনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

কিছু বিশ্বায়ন নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে বিতর্ক বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সর্বজন গ্রাহ্য নীতি হিসাবে বিশ্বায়ন রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের কাছে এখনো সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি। দ্য কানাডিয়ান ইউনিটারিয়ান কাউন্সিল দ্বারা গৃহীত বিশ্বায়ন সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিশ্বায়ন হল এমন 'একটি প্রক্রিয়া' যা পুঁজিবাদের আর্থসামাজিক বিকাশের একটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হল এমন এক সার্বিক প্রক্রিয়া– যাতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অবাধ আদান-প্রদান চালানো সম্ভব হয়।

প্রকৃতি ঃ

(1) **আর্থিক দিক ঃ-** পুঁজির অবাধ চলাচল, মুক্তবাজার অর্থনীতি, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রভৃতি ধারণার সঙ্গে বিশ্বায়ন নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশ্বায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — (ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার (খ) বিভিন্ন এলাকার জনগণের অভিগমন (immigration) ও নির্গমন (migration) (গ) বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ ও অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চালন (ঘ) এক দেশের পুঁজি অন্য দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প, কৃষি ও নানারকম পণ্য উৎপাদন করে অন্যান্য দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা (ঙ) দেশ থেকে দেশান্তরে লগ্নি পুঁজির আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা। (চ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান (ছ) প্রযুক্তি ও তথ্য মাধ্যমের বিস্তার ও বিভিন্ন দেশের তথ্য মাধ্যমের ওপর বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির প্রয়োগ।

ফলাফল ঃ- বিশ্বায়নের যুগে IMF বিশ্বব্যাংক ও WTO ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৃহৎ পুঁজিবাদি রাষ্ট্রগুলি লগ্নি পুঁজির সম্পরসারণের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ঋণগ্রহণকারী তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজার উন্মুক্ত করা, তাদের অর্থনীতিকে বাজারের উত্থান-পতনের ওপর ছেড়ে দেওয়া, বহুজাতিক পুঁজির অবাধ যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত করা, আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ইত্যাদি এরূপ সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে দেশীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। পরিকাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বহুজাতিক স্বংস্থাগুলি কার্যত অবাধে শোষণ প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। বর্তমানে 'hire and fire' নীতি প্রয়োগ করে শ্রমিকদের প্রয়োজনে কাজে যোগ দেওয়া—আবার কাজ না থাকলে কর্মচ্যুত করার ফলে তাদের জীবনে অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশা, দারিদ্র নেমে এসেছে।

(2) **রাজনৈতিক দিক ঃ**- রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়ন জাতিরাষ্ট্রের সর্বতো বিরোধী। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পরিচালিত রাষ্ট্র মানুষের সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য দায়বদ্ধ থাকে। তাই এইসব রাষ্ট্র শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে পুঁজির অবাধ মুনাফা ও শোষনের ওপর নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে। তাই বিশ্বায়নের প্রবক্তারা সেই ধরণের জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা চায় যেখানে পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তি ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক

অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সীমাহীন দমন পীড়নের নীতি গ্রহণ করতে পিছুপা হবে না।

ফলাফল ঃ- রাজনৈতিক বিশ্বায়ন মূলত রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর ভূমিকাকেই অস্বীকার করেছে। জোসেফ এস. নাই এবং জন ডি. জোনাহিউ লিখেছেন— বিশ্বায়নের যুগে মূলধনের সচলতা, একদেশ থেকে অন্য দেশে দক্ষ শ্রমিকের নির্গমন, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ ও শেয়ার হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়গুলি সরকারের কর আরোপ করার চিরাচরিত ক্ষমতাকে ব্যাহত করেছে।

(3) **সাংস্কৃতিক দিক ঃ-** সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের লক্ষ্য হল বিশ্বজুড়ে একটি সমরূপ সংস্কৃতি গড়ে তোলা। ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে এইরকম সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলছে। এভাবে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সংস্থাগুলি সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতিকে জাতি-রাষ্ট্রের গন্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সফল হয়েছে। বিশ্বায়নে প্রবক্তাদের মতে স্বল্প সময় ও খরচে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে ও তথাকথিত পুরোনো সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

ফলাফল ঃ- এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমি ভোগবাদী সংস্কৃতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। এর ফলে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা (যেমন – মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি ও বাড়ি ইত্যাদি) ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় ও টিভি-সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে বিকৃত যৌনতা ও মাফিয়াতন্ত্রসহ হিংস্রতাকে মনুষ্যসমাজের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। শিশু ও কিশোর মনে বিকৃত সংস্কৃতির প্রভাব আগামীদিনে জাতীয়তাবোধ ও সুস্থ পারিবারিক সমাজজীবনকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

(4) **পরিবেশগত দিক ঃ-** অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বহুজাতিক সংস্থার শিল্প কারখানাগুলি পরিবেশকে দূষণ ও বিষাক্ত করে তুলছে। জৈব রসায়নজাতীয় শিল্পের প্রয়োগে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কলকারখানার পরিত্যক্ত বর্জ্য, নদীর জল ও বাতাসকে দূষিত করছে। তবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কঠোরতার ফলে বহুজাতিক স্বংস্থাগুলি তৃতীয় বিশ্বে পরিবেশের সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ও সক্রিয়া হয়েছে।

(2) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করো।

উ: বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য প্রধান তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলি হল– আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। আইনবিভাগ যে আইন তৈরি করে শাসনবিভাগ সেই আইন প্রয়োগ করে। অন্যদিকে বিচার বিভাগ আইন বিভাগ দ্বারা তৈরি আইনের দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ করবে না;

এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত থাকবে না।

পক্ষে যুক্তি ঃ-

(1) **তিন বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ঃ-** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। ফলে এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং তিন বিভাগের নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় থাকে।

(2) **কার্যকারিতা বৃদ্ধি ঃ-** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে সরকারের মুখ্য তিনটি বিভাগ (আইন, শাসন ও বিচার) সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এবং কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

(3) **স্বৈরাচারিতা রোধ ঃ-** স্বৈরাচারী প্রবণতারোধে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি অত্যন্ত কার্যকরী। কারণ আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন নীতির বাধ্যবাধকতায় স্বৈরাচারি হয়ে উঠতে পারে না।

(4) **দায়িত্ব ঃ-** সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা থাকে এই নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে। ফলে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগও বিচার বিভাগ স্বীয় স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকে।

(5) **রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিমত ঃ-** মঁন্তেস্কু ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের আবশ্যিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, জন লক্ ও হ্যারিংটন প্রমুখও ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ-

(1) **বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয় ঃ** সমালোচকদের মতে, এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয়। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সরকারের প্রধান তিনটি বিভাগ (আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ) পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সরকার পরিচালনা করে। সংসদীয় বা রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার দুটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপরিচালনায় এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তি বিশেষ একাধিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। যেমন ভারতে মন্ত্রীসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরেই দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করে থাকেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভিটো প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে আইনসভা প্রণীত আইন বাতিল করে দিতে পারেন। বর্তমানে দলব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে সরকার পরিচালিত হওয়ার ফলে আইন ও শাসনবিভাগের নৈকট্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

(2) **বাস্তবায়ন সম্ভব নয় ঃ-** জন স্টুয়ার্ট মিল, ব্লুন্টস্লি, ফাইনার ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগ কাম্য নয়। কারণ নীতিটি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন বিভাগের

মধ্যে বিবাদ দেখা দেবে। ল্যাস্কির মতে, তিনটি বিভাগ যদি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কাজ করে তাহলে প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্বশীলতা বিনষ্ট হবে। বিভাগগুলির স্বতন্ত্র অবস্থান বিরোধ সৃষ্টি করবে, ফলে জনস্বার্থ ব্যাহত হবে।

(3) **প্রয়োগের কুফল ঃ-** ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরন নীতিটি বাস্তবায়িত হলে অনেক বৈষম্য দেখা দিতে পারে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ও আইনবিভাগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য কিছু রাজ্যের বিচারকগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বিচারপতি রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্যপ্রার্থী হন। তাই নির্বাচিত বিচারপতিদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারে।

(4) **ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ নয় ঃ-** স্যাবাইন, গিলক্রিস্ট প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন নীতিটিকে স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ হিসাবে মনে করেন না। কারণ আইন বিভাগ স্বৈরাচারী আইন প্রনয়ন করলে শাসনবিভাগ সেই আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য থাকে এবং বিচারবিভাগ ও স্বৈরাচারী আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করবে। তাই ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণনীতি কখনো ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হতে পারে না। ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ হল সদাসতর্ক জনগণ।

(5) **জৈব মতবাদীদের সমালোচনা ঃ-** জৈব মতবাদীদের মতে, সরকারকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় যে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করতে পারে না, তেমনি সরকারের বিভাগগুলি কখনোই পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করতে পারে না।

(6) **সব বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন নয় ঃ-** ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরননীতি অনুযায়ী সরকারের মুখ্য তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে দেখা যায় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে শাসনবিভাগ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। আবার, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে আইন বিভাগের কৌলিন্য বেশি কারণ আইনি বিভাগ প্রণীত আইনই শাসন ও বিচারবিভাগের প্রয়োগ ও বিচারের ক্ষেত্র।

(7) **মার্কসবাদী মতামত ঃ-** মার্কসবাদীদের মতে, যেকোন সরকার মাত্রই একটি বিশেষ তথা পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। অতএব বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ অর্থহীন। সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগই পৃথকভাবে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে।

পরিশেষে বলা যায় পূর্ণ ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ কাম্য না হলেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আংশিক ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ তথা বিচারবিভাগের স্বাধীণতা রক্ষা করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য বিচারবিভাগকে আবশ্যই শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

(3) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

উ: লর্ড ব্রাইস, জন স্টুয়ার্ট মিল, লেকি, হেনরি মেইন, লর্ড অ্যাক্টন, দ্যুগুই, গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

সপক্ষে যুক্তি ঃ-

(1) **সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন ঃ-** অনেক সময় সাময়িক উত্তেজনা বা জনমতের চাপে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা জাতীয় স্বার্থবিরোধী আইন তৈরি করতে পারে। কিন্তু দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় উভয় কক্ষে আলাপ আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনস্বার্থে সুচিন্তিত আইন তৈরির সম্ভাবনা থাকে।

(2) **নিম্নকক্ষের স্বৈরাচারিতা বোধ ঃ-** লর্ড অ্যাকটন আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষকে ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় স্বৈরাচারী আইন প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আইনসভার সমক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কক্ষ থাকলে একে অপরের স্বৈরাচারিতা রোধ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।

(3) **জনমতের প্রতিফলন ঃ-** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার দুটি কক্ষের নির্বাচন পৃথক পৃথক সময়ে হয় বলে প্রবহমান জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলন আইনসভায় লক্ষ করা যায়। তাই জনমতের সুষ্ঠু প্রতিফলনের জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন।

(4) **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আবশ্যিক ঃ-** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় আঞ্চলিক স্বার্থের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করা হয়। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষে নির্বাচিত সদস্যরা জাতীয় স্বার্থ এবং উচ্চকক্ষে মনোনীত সদস্যরা আঞ্চলিক স্বার্থে কাজ করতে পারেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা অপরিহার্য বলে মনে করা হয়।

(5) **রাজনৈতিক শিক্ষা ঃ-** এইরূপ আইনসভার দুটি কক্ষে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে আইন প্রণীত হয়ে থাকে। আইন সভার দুটি কক্ষেই ভিন্নমতাদর্শী দলের সদস্যদের মধ্যে আইন প্রণয়নের সময় তর্ক বাদানুবাদ চলে থাকে, নানারকম যুক্তি পাল্টা যুক্তির উপস্থাপনা হয়ে থাকে। এইসব কার্যক্রম দুরদর্শনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। এর ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

(6) **সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ঃ-** সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় না থাকলে গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। সেক্ষেত্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পরোক্ষ নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি পাঠানো যায়। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরা আইনসভায় নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। দ্যুগুই-এর অভিমত হল, শ্রেষ্ঠ আইনসভার নিদর্শন হল এককক্ষে জনপ্রতিনিধিত্ব অন্যকক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব।

(7) **জ্ঞানীগুণি ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব ঃ-** অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপস্থিতি আইনসভার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। গুণী, শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ অনেক সময় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সমস্যার ও শ্রমের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না। তাই আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উচ্চকক্ষে এই সব জ্ঞানী-গুণীদের মনোনীত করা সম্ভবপর হয়।

(8) **সমাজতন্ত্রবাদীদের বক্তব্য ঃ**- সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে, বহু জাতিসমন্বিত রাষ্ট্রে প্রতিটি গোষ্ঠী যাতে স্বীয়-স্বীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারে সেজন্যই দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ-

এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সমর্থক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই যুক্তিগুলির সমালোচনা করে বলেন—

(1) **অগণতান্ত্রিক গঠন ঃ**- গণতন্ত্র যেহেতু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে জনগণের জন্য শাসন, তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়েই গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোন থেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে অগণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে।

(2) **অনাবশ্যক ঃ-** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় উভয় কক্ষেই যদি একই রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া আইনের গুণাগুণ বিচার না করেই উচ্চকক্ষে তা গৃহীত হয়ে যায়। অন্যদিকে দুটি কক্ষই যদি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় দুই কক্ষে যদি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় তাহলে তীব্র মতবিরোধের ফলে আচলাবস্থা দেখা দেবে, ফলে জনস্বার্থ ব্যহত হবে। এ প্রসঙ্গে আবেসিঁয়ে বলেছেন, 'দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের সঙ্গে একমত হয়, তবে তা অনাবশ্যক'; আর যদি ভিন্নমত পোষন করে, তবে তা ক্ষতিকর।

(3) **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য নয় ঃ**- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে আবশ্যিক নয়। সংবিধানের মাধ্যমেই কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। ল্যাস্কির মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত আছে।

(4) **জ্ঞানীগুণিরা উপেক্ষিত থাকে ঃ**- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। তাই দ্বিতীয় কক্ষে সদস্য মনোনয়ন বা নির্বাচনে দলীয় রাজনীতিই প্রাধান্য বিস্তার করে। নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যপদ লাভ করেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত উপযুক্ত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা দ্বিতীয় কক্ষের সদস্য হতে পারেন না।

(5) **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশয় ঃ-** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে এমন রাষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার প্রথম কক্ষের থেকে কম। অর্থবিলের ব্যাপারে দ্বিতীয় কক্ষের মতামতের কোনো মূল্য নেই। অথচ নিয়মানুগ পদ্ধতি পালনে অযথা বিলম্বের ফলে কোন নীতির চূড়ান্ত রূপ দিতে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(6) **সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষায় আবশ্যিক নয় ঃ**- সংবিধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সঠিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। তাই সংখ্যালঘু স্বার্থ সুরক্ষায় দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন নেই বলেই অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

(7) **ব্যয়বহুল ঃ**- আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে উচ্চকক্ষের গঠন, নিয়ন্ত্রণ, পরিষেবা ও সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া, বেতন ভাতা ইত্যাদির জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়। তাই এত ব্যয়বহুল দ্বিতীয় কক্ষের অপ্রয়োজনীয়তার পক্ষেই অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

(4) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসমূহ আলোচনা করো।

উ: সংবিধানের ৫৩(1) নং ধারা অনুযায়ী ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার পরামর্শ মত পরিচালিত হতে বাধ্য বলে কার্যত তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত।

একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এর মাধ্যমে একটি নির্বাচক সংস্থা কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

ক্ষমতাসমূহ ঃ-

(1) **শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ**- রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়—

(i) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। (ii) কেন্দ্রের সমস্ত কাজ ও আইন তৈরির পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা অর্থাৎ মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি জ্ঞাত হবেন। (iii) অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল, অ্যাটর্নি জেনারেল ও জনপালন কৃত্যক কমিশনের সভাপতি সহ সদস্যদের তিনি পদচ্যুত করতে পারেন। (iv) প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য তিনি প্রশাসক নিয়োগ করতে পারেন।

(2) **সামরিক ক্ষমতা ঃ**- রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তিনি স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন। পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা শান্তি স্থাপন করতে পারেন।

(3) **কূটনৈতিক ক্ষমতা ঃ**- রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের প্রেরণ করেন। বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা তাঁর কাছে নিজ নিজ পরিচয়পত্র পেশ করেন এবং তিনি তাঁদের গ্রহণ করেন। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি, চুক্তি তাঁর নামেই সম্পাদিত হয়।

(4) **আইন বিষয়ক ক্ষমতা ঃ-** রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। প্রয়োজনে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের যৌথ অধিবেশন ডাকতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের পরে তিনি আইনসভার উভয় কক্ষে ভাষণ দেন। রাজ্যসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মনোনীত করতে পারেন। ল্যকসভায় ২ জন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যকে মনোনীত করেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বিল তাঁর সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলে তিনি সম্মতি নাও

দিতে পারেন। তবে পুনরায় পার্লামেন্ট কর্তৃক উক্ত বিল গৃহীত হলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত কোনো বিলে তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন তিনি 'অর্ডিন্যান্স' জারি করতে পারেন। পরে অবশ্য 'অর্ডিন্যান্স'কে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয় নচেৎ বাতিল হয়ে যায়।

এছাড়া কোনো রাজ্যের সীমানা বা নাম পরিবর্তন, নতুন রাজ্য গঠনের প্রস্তাব, অর্থ কমিশন সুপারিশ, অর্থবিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বা পূর্বসম্মতি সাপেক্ষে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হতে পারে।

(5) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** রাষ্ট্রপতির অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল- (i) অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রত্যেক বছরের জন্য পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করা। (ii) তাঁর সুপারিশ ছাড়া কোনো ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাব, অর্থবিল প্রভৃতি পার্লামেন্টে পেশ করা যায় না। এছাড়া তাঁর পূর্ব সুপারিশ ছাড়া কর, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ক বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করা যায় না। (iii) কেন্দ্র-রাজ্য রাজস্ব বণ্টনের জন্য প্রতি ৫ বছর অন্তর তিনি অর্থ কমিশন গঠন করেন।

(6) **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** (i) সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের তিনি নিয়োগ করেন এবং পার্লামেন্টের সুপারিশে তাঁদের পদচ্যুত করতে পারেন। (ii) এছাড়া অপরাধীকে ক্ষমা করা, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি হ্রাস বা স্থগিত করা, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে ক্ষমা করা বা শাস্তি হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে।

(7) **নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** প্রধানমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, অ্যাটর্নি জেনারেল, ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্য, অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল প্রমুখ পদাধিকারীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন।

(8) **জরুরী অবস্থা জারিসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ**- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন–

(i) **জাতীয় জরুরি অবস্থা ঃ-** সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ, অতিমারী, বিপর্যয় বা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে দেশের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হতে পারে, তাহলে তিনি সমগ্র দেশে বা দেশের কোন অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

(ii) **রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থার ক্ষেত্রে ঃ**- কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের রিপোর্ট বা অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি যদি ওই রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হন তাহলে ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী ওই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে পারেন।

(iii) **আর্থিক জরুরি অবস্থা ঃ**- সংবিধানের ৩৬০ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ভারতের বা ভারতের কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বিনষ্ট হয়েছে

বা অতিমারি, মহামারি অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে সেক্ষেত্রে তিনি আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন।

(9) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ-** রাষ্ট্রপতিকে আরও যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় সেগুলি হল ঃ- (i) নানাবিধ বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন। (ii) জনস্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ। (iii) যে কোনো অঞ্চলকে তপশিলি অঞ্চল বা কোনো তপশিলি অঞ্চলকে অ-তপশিলি অঞ্চল বলে ঘোষণা করা, তপশিলি অঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করা, ইত্যাদি।

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আসীন থাকলেও তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক। সাংবিধানিকভাবে রাষ্টপতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(5) ভারতের হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো।

উ: রাজ্যের বিচারবিভাগের শীর্ষে রয়েছে হাইকোর্ট। বর্তমানে ভারতে ২১টি হাইকোর্ট রয়েছে। যদিও সংবিধান অনুযায়ী ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে (২১৪ নং ধারা)। কিন্তু পার্লামেন্ট আইন করে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট স্থাপন করতে পারে।

গঠন ঃ- রাজ্যের হাইকোর্টগুলিতে কতজন করে বিচারপতি থাকবে সে বিষয়ে সংবিধানে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। সংবিধানে উল্লেখ আছে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্য কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হবে। অন্যান্য বিচারপতিদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্যতাবলী হল— (i) অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (ii) বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে ১০ বছর আসীন থাকতে হবে অথবা হাইকোর্ট বা দুই বা ততোধিক এই ধরনের আদালতে ১০ বছর একাদিক্রমে আইনজীবি হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

হাইকোর্টের বিচারপতিরা ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তবে প্রমাণিত অসদাচারণ বা অক্ষমতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে পার্লামেন্ট উভয়কক্ষে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি অভিযুক্ত বিচারপতিকে অপসারিত করতে পারেন।

কার্যাবলী ঃ- ভারতীয় সংবিধানে হাইকোর্টের কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে সর্বক্ষেত্রেই তাদের সংবিধান এবং আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের গন্ডির

মধ্য থেকে বিচার কার্য সম্পাদন করতে হবে। হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নলিখি ভাগে আলোচনা করা যায় ঃ-

(1) **মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা ঃ-** রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্গত। এছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাকেও মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। তবে শুধুমাত্র কলকাতা, চেন্নাই ও মুম্বাই হাইকোর্টের মূ ল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা রয়েছে।

(2) **আপিল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা ঃ-** রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হল হাইকোর্ট। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা জজ এবং অধস্তন জেলা জজের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। কোনো নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপ্ল পিল মামলায় কোন উচ্চ আদালত যে রায় দেয়, তার বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যায়। এছাড়া, হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের কোন রায়ের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল করা যায়।

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে দায়রা জজ এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ কোনো ব্যক্তিকে ৭ বছরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে অথবা সহকারী দায়রা জজ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্যান্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়।

(3) **নির্দেশ, আদেশ, লেখ জারির ক্ষমতা ঃ-** হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ, নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারে। অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যেও হাইকোর্ট লেখ, নির্দেশ বা আদেশ জারি করতে পারে। জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলেও হাইকোর্ট 'বন্দি-প্রত্যক্ষকীকরণ' ধরনের লেখ জারির ক্ষমতা ভোগ করে।

(4) **আইনের বৈধতা বিচার ঃ-** কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে।

(5) **তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ঃ-** হাইকোর্ট সামরিক আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ছাড়া অন্যান্য আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহের তত্ত্বাবধান করতে পারে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী হাইকোর্ট যে কোনো প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিল করার জন্য অধস্তন আদালত-সমূহকে নির্দেশ দিতে পারে।

(6) **মামলা অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা ঃ-** সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে এমন কোনো মামলা নিম্ন আদালতে বিচারাধীন থাকলে হাইকোর্ট উক্ত মামলাটি বিচারের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারে।

(7) **নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঃ-** জেলা জজের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে এবং নিম্ন আদালতগুলির অন্যান্য বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল

হাইকোর্টের পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জেলা আদালতসহ অন্যান্য নিম্ন আদালতের কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে হাইকোর্টের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

(8) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ**- সুপ্রিমকোর্টের মত হাইকোর্ট ও অভিলেখ আদালত (Court of Records) হিসাবে কাজ করে। হাইকোর্ট নিজ অবমাননাকারীকে শাস্তি দিতে পারে।

হাইকোর্ট বিচারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী তৈরি করতে পারে।

হাইকোর্টের গঠন ও ক্ষমতাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে হাইকোর্ট সর্বভারতীয় বিচারব্যবস্থার একটি অঙ্গ। হাইকোর্টের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, অপসারণ, নতুন হাইকোর্ট গঠন, এক্তিয়ার বৃদ্ধি বা হ্রাস, বেতন-ভাতার হ্রাস বৃদ্ধি স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, এছাড়া হাইকোর্টের যে কোনো রায় সুপ্রিমকোর্ট বাতিল করতে পারে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশিকা মানতে হাইকোর্ট বাধ্য। তাই হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের অধীন সহায়ক আদালত হিসাবে কাজ করে।

(6) আথবা, ভারতের লোক আদালতের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করো।

উ: বিভিন্ন বিষয়ে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আদালতগুলির পক্ষে বিভিন্ন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মামলাগুলির নিষ্পত্তি হতে বহু বছর ও সময় অতিক্রান্ত হয়। আদালতগুলির পরিকাঠামোজনিত সীমাবদ্ধতার জন্য মামলার মীমাংসা হতে বহু সময় লাগে। দীর্ঘকাল ব্যয়বহুল মামলা চালানোও অসম্ভব, তাই কম গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি ও নাগরিকদের বিনা ব্যয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে লোক আদালত গঠন করা হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ- ১৯৮২ সালে গুজরাটে লোক আদালতের যাত্রা শুরু হলেও Legal Service Authorities Act, 1987, কার্যকরী হওয়াতে লোক আদালতগুলি আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরবর্তীতে ভারত সরকারের সব মন্ত্রক ও দপ্তরের জন্য একটি লোক আদালত স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যেও লোক আদালত গঠিত হয়েছে।

গঠন ঃ- আইনগত পরিসেবা কর্তৃপক্ষ আইনটি ১৯৯৪ সালে সংশোধিত হওয়ার পর ১৯(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা ও তালুকে আইনগত পরিসেবা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এই কর্তৃপক্ষের হাতে লোক আদালত গঠনে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯(2) নং ধারা অনুযায়ী একটি অঞ্চলের লোক আদালত– কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের এবং অন্য কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হবে। অন্য ব্যক্তির সংখ্যা সংশ্লিষ্ট এলাকার আইনগত পরিসেবা কর্তৃপক্ষ স্থির করে। সাধারণত একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি ও একজন সমাজসেবীকে লোক আদালতের

অন্যান্য সদস্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়। বিচার বিভাগীয় আধিকারিক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

কার্যাবলী ঃ- বিবদমান দুটি পক্ষের যে কোনো একটি পক্ষ বিরোধ মীমাংসার জন্য লোক আদালতে লিখিতভাবে আবেদন জানাবে। আবেদনপত্রের বিষয় বিবেচনার পর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে সংশ্লিষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তির দায়িত্ব আদালত গ্রহণ করে লোক আদালতের কার্যাবলী বিচার বিভাগীয় কার্যপদ্ধতির অনুরূপ। বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে ন্যায়, সততা, সমদর্শিতা ও অন্যান্য আইনানুগ নীতি গ্রহণ করা হয়। আদালতের সিদ্ধান্ত বিবদমান পক্ষগুলি মেনে নিতে বাধ্য থাকে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আদালতের রায় কার্যকর করা হয়। লোক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না। তবে সংশ্লিষ্ট লোক আদালত কোনো বিবাদের মীমাংসা করতে না পারলে পক্ষগুলি সাধারণ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।

লোক আদালতে বিশেষ জটিল বিষয়ের বিচার কার্য হয় না। সাধারণত দীর্ঘদিন যে সব মামলার নিষ্পত্তি হয়নি বা বিচারের আগে অন্য কোনো আদালত বা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পাঠানো বিরোধের বিষয় প্রভৃতি লোক আদালতে বিচারের জন্য বিবেচিত হয়। লোক আদালতে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত দাবি, বিবাহসংক্রান্ত বিরোধ, বিমা কোম্পানিগুলির সাথে অর্থ বিষয়ক বিবাদ ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসা করা হয়।

Part - B

1. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : **1 × 24 = 24**

(i) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়

(a) 1919 সালে (b) 1920 সালে

(c) 1939 সালে (d) 1945 সালে

উ: 1939 সালে

(ii) 'ঠান্ডা লড়াই' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন

(a) বার্নাড বারুচ (b) টুম্যান

(c) চার্চিল (d) গর্বাচেভ

উ: বার্নাড বারুচ

(iii) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জনক হলেন

(a) ইন্দিরা গান্ধী (b) সুকর্ণ

(c) মার্শাল টিটো (d) জওহরলাল নেহেরু

উ: জওহরলাল নেহেরু

(iv) পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

(a) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে (b) ভারত ও ভূটানের মধ্যে

(c) ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে (d) ভারত ও চীনের মধ্যে

উ: ভারত ও চীনের মধ্যে

(v) 'ন্যাটো' গঠিত হয় কার উদ্যোগে?

(a) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (b) সোভিয়েত ইউনিয়ন

(c) ব্রিটেন (d) ভারত

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(vi) বর্তমানে 'সার্ক'-এর সদস্য সংখ্যা হল

(a) 7 (b) 8

(c) 9 (d) 10

উ: 8

(vii) ভারত-পাক সিমলা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল কোন সালে ?

(a) 1965 (b) 1978

(c) 1972 (d) 1975

উ: 1972

(viii)সার্ক'-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

(a) ঢাকায় (b) কলম্বোতে

(c) দিল্লিতে (d) ইসলামাবাদে

উ: ঢাকায়

(ix) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা হল

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

উ: 5

(x) নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হল

(a) 10 (b) 15

(c) 20 (d) 25

উ: 15

(xi) ভেটো প্রদান ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র

(a) সাধারণ সভার।

(b) আন্তর্জাতিক আদালতের।

(c) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের।

(d) অছি পরিষদের।

উ: নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের

(xii) সাধারণ সভায় 'শান্তির জন্য ঐক্যের প্রস্তাব' গৃহীত হয় কোন সালে ?

(a) 1948 (b) 1950

c) 1955 (d) 1960

উ: 1950

(xiii)'স্পিরিট অফ্ দ্য লজ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(a) মার্কস (b) হেগেল

(c) হবস্ (d) মন্টেস্কু

উ: মন্টেস্কু

(xiv)মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম হল

(a) লোকসভা (b) রাজ্যসভা

(c) সেনেট (d) জনপ্রতিনিধি সভা

উ: সেনেট

(xv) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নাম হল

(a) লর্ড সভা (c) কমন্স সভা

(b) সেনেট (d) লোকসভা

উ: কমন্স সভা

(xvi)এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে এমন একটি রাষ্ট্র হল

(a) গ্রেট ব্রিটেন (b) চীন

(c) ভারত (d) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

উ: চীন

(xvii) উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত শাসক দেখা যায়

(a) পাকিস্তানে (b) বাংলাদেশে

(c) গ্রেট ব্রিটেনে (d) ভারতে

উ: গ্রেট ব্রিটেনে

(xviii) ''ন্যায়বিচারের দীপশিখাটি অন্ধকারের মধ্যে নিভে গেলে কী ভীষণ সেই অন্ধকারএকথা বলেছেন

(a) লর্ড ব্রাইস (b) ফ্র্যাঙ্কলীন

(c) গেটেল (d) মার্কস

উ: লর্ড ব্রাইস

(xix)ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন

(a) সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি (b) লোকসভার স্পিকার

(c) রাষ্ট্রপতি (d) উপরাষ্ট্রপতি

উ: রাষ্ট্রপতি

(xx) লোকসভার সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা হল

(a) 530 (b) 545

(c) 550 (d) 552

উ: 552

(xxi) রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের স্বাভাবিক সময়সীমা হল

(a) 4 বছর (b) 5 বছর

(c) 6 বছর (d) 7 বছর

উ: (c) 6 বছর

(xxii) পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয়

(a) 1947 সালে (b) 1973 সালে

(c) 1977 সালে (d) 1982 সালে

উ: 1973 সালে

(xxiii) পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হয়

(a) সভাপতি (b) মন্ত্রী

(c) কাউন্সিলর (d) ম্যাজিস্ট্রেট

উ: কাউন্সিলর

(xxiv) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রশাসনিক প্রধান হলেন

(a) সপরিষদ মেয়র (b) মেয়র

(c) ডেপুটি মেয়র (d) মন্ত্রী

উ: মেয়র

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : 1 × 16 = 16

(i) বেলগ্রেড সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উ: বেলগ্রেড সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1961 খ্রিস্টাব্দে।

অথবা

বর্তমানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের একটি প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করো।

উ: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ঠান্ডা লড়াই মুক্ত বিশ্বে বিশ্বায়নের প্রভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন করতে পারে।

(ii) সুয়েজ সংকট কবে দেখা দেয়?

উ: সুয়েজ সংকট দেখা দেয় 1956 খ্রিস্টাব্দে।

অথবা

কিউবার সংকট কবে দেখা দেয়?

উ: কিউবার সংকট দেখা দেয় 1962 খ্রিস্টাব্দে।

(iii) জাতীয় ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?

উ: জাতীয় ক্ষমতা বলতে বোঝায় সেই দেশের জনগণের জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও আত্মবিশ্বাস এবং তৎসহ একটি দৃঢ় জনসমর্থন ভিত্তিক শক্তিশালী সরকার। এছাড়া অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা ও জাতীয় ক্ষমতার নির্ণায়ক।

অথবা

জাতীয় স্বার্থ বলতে কী বোঝায়?

উ: জাতীয় স্বার্থ বলতে বোঝায় জাতির সেইসব নূন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে, যেগুলি পূরণের জন্য রাষ্ট্রসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। তৎসহ জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ও উল্লেখযোগ্য।

(iv) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উ: ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল- জোটনিরপেক্ষতা।

(v) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার নাম লেখো।

উ: FAO (খাদ্য) ও কৃষি সংস্থা- Food and Agtriculture Organisation

(vi) মার্কসবাদের যে কোনো দুটি উৎস উল্লেখ করো।

উ: মার্কসবাদের দুটি উৎস হল- (1) জার্মান দর্শন (2) ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

অথবা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে কোন দুটি সূত্র উল্লেখ করো।

উ: দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দুটি সূত্র হল- (i) বস্তুজগতের প্রতি-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বস্তুজগতের ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হল দ্বন্দ্বমূলক (ii) বস্তুজগতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এর ধারণা ও তত্ত্ব হল বস্তুবাদী। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দুটি দিক- (1) দার্শনিক (2) পদ্ধতিগত।

(vii) গান্ধীজির অহিংস নীতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উ: (1) গান্ধীজির কাছে অহিংসাই ছিল সত্য আর সত্যই হল ঈশ্বর। (2) তাঁর মতে অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে নিজের রক্তপাত বা আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে কিন্তু কোনোওভাবে সহিংস হওয়া যাবে না।

অথবা

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ নীতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উ: গান্ধিজির সত্যাগ্রহ নীতির দুটি বৈশিষ্ট্য হল- (১) সত্য (২) আত্মনিগ্রহ

(viii)এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে একটি যুক্তি দাও।

উ: এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গণতন্ত্রের অনুপন্থী। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তাই নির্বাচিত সদস্যরা জনস্বার্থ রক্ষা করে চলেন।

(ix) স্থায়ী প্রশাসক বলতে কী বোঝো?

উ: স্থায়ী প্রশাসক বলতে বোঝায় যারা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বেতনের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারি হিসাবে নিযুক্ত হন। এরা রাষ্ট্রকৃত্যক (Civil Servant) নামে পরিচিত। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক অংশের পরিবর্তন হয় কিন্তু এদের কার্যকালের মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। এই রাষ্ট্রকৃত্যকদের মাধ্যমেই সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি কার্যকর হয়।

(x) বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

উ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হল—

১) বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব একান্ত প্রয়োজন। কার্যকাল স্বল্পস্থায়ী হলে ন্যায়বিচার উপেক্ষিত হতে পারে।

২) বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতি যথেষ্ট কঠোর হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র অক্ষমতা, অযোগ্যতা, দুর্নীতি, সংবিধানভঙ্গ ইত্যাদি গুরুতর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করার বিধান থাকা উচিৎ।

(xi) ভারতের রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে কীভাবে অপসারিত হন?

উ: ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানভঙ্গের অপরাধে 61 নং ধারায় বর্ণিত 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করা যায়। অর্থাৎ সংসদের দুটি কক্ষে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা অন্তে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়।

অথবা

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন?

উ: ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচক সংস্থা কর্তৃক একক-হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মানুযায়ী গোপন ভোটে নির্বাচিত হন।

(xii) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করো।

উ: সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি অনুযায়ী মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন এবং দপ্তর বণ্টন করেন।

(xiii)ভারতের অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের যে কোন একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা উল্লেখ করো।

উ: রাজ্যের শাসনকার্যাদি সংবিধানসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট প্রদান।

অথবা

ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কে নিয়োগ করেন?

উ: ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল।

(xiv)'জিরো আওয়ার' কাকে বলে?

উ: আইনসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হওয়ার ঠিক পরেই শুরু হয় 'জিরো আওয়ার' দুপুর 12টা থেকে বেলা 1টা পর্যন্ত আইনসভার যে-কোনো কক্ষের কাজকর্ম চলতে থাকলে সেই সময় হল 'জিরো আওয়ার'।

অথবা

'ছাঁটাই প্রস্তাব' কয় প্রকার?

উ: ছাঁটাই প্রস্তাব—তিন প্রকার।

১) নীতি অনুমোদন-সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব

২) ব্যয় সংক্ষেপের জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব

৩) প্রতীকী ছাঁটাই প্রস্তাব

(xv) ভারতের মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোনো দুটি 'লেখ'-এর নাম উল্লেখ করো।

উ: বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ ও পরমাদেশ।

(xvi)বরো কমিটি কিভাবে গঠিত হয়?

উ: 3 লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট পৌরসভায় বরো কমিটি গঠন করা যায়। নির্বাচনের পর ওয়ার্ডগুলিকে 5টি বরোতে ভাগ করা হয়। যাতে প্রতিটি বরো পরস্পর-সংলগ্ন অন্তত 6টি করে ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হতে পারে। যেসব ওয়ার্ড নিয়ে বরো গঠিত হয় সেইসব ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা বরো কমিটির সদস্য হয়ে থাকেন। কাউন্সিলারদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বরো কমিটি স-পরিষদ চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রনাধীন থেকে কাজ করে।১

Political Science

2016

PART - A (30 Marks)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ-

(a) ক্ষমতা কাকে বলে ? ক্ষমতার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করো।

উঃ হ্যান্স মরগেনথাউ-এর মতে, 'রাজনৈতিক ক্ষমতা' হল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারীদের নিজেদের মধ্যে এবং সাধারণভাবে তাদের সঙ্গে জনগণের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণমূলক সম্পর্ককে বোঝায়। জোসেফ ফ্রাঙ্কেল বলেছেন যে, অন্যের মন ও কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে কাঙ্খিত ফললাভের সামর্থ্যই হল ক্ষমতা। কার্ল ডয়েসের অভিমত হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে শক্তি হল 'একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্যান্য রাষ্ট্রের আচরণকে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য।'

অতএব ক্ষমতা বলতে অন্যকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যকে বোঝায় যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী তার ইচ্ছা মতো কাজ করতে অন্যদের বাধ্য করে।

অনেক সময় ক্ষমতা ও বলপ্রয়োগকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। কিন্তু কৌলম্বিস ও উল্‌ফের মতে, বলপ্রয়োগের অর্থ সামরিক শক্তির প্রয়োগ। বাস্তবে ক্ষমতার ধারণা অনেক বেশি বিস্তৃত। ক্ষমতা শুধু শক্তি প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের ভীতিকেই বোঝায় না, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে নিজের পক্ষে আনয়ন, অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান, সহযোগিতা ও মতাদর্শের মেলবন্ধনের মতো ইতিবাচক এবং হিংসা বর্জিত নীতির অনুসরণকেও বোঝায়।

উপাদানসমূহ ঃ-

(1) **ভৌগলিক উপাদান ঃ**- মরগেনথাউ-এর মতে, ''সবচাইতে স্থায়ী যে উপাদানটির ওপর একটি জাতির শক্তি নির্ভর করে সেটি হল ভূগোল।'' জাতীয় শক্তির নিয়ন্ত্রক হিসাবে ভৌগলিক শক্তির গুরুত্বকে মুখ্যত চারভাগে আলোচনা করা যায় –

(i) **অবস্থান ঃ-**অনুকূল ভৌগলিক অবস্থানের ওপর একটি দেশের জাতীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নির্ভর করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় ইউরোপ বা এশিয়ার কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে সহজে ওই দেশকে আক্রমনণ করা সম্ভব নয়। অবস্থানগত সুবিধার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী ও শক্তিশালী স্কুল ও বিমান বাহিনীও গড়ে তুলেছে। ইংলিশ প্রণালী ব্রিটেনকে

বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থেকে যেমন রক্ষা করেছে পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক শক্তি হিসাবেও ব্রিটেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের সীমান্তকে হিমালয় পর্বত সুরক্ষিত করেছে কিন্তু বাণিকি কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করেছে। তবে বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র বলে বলীয়ান রাষ্ট্রগুলি যদি পারস্পরিক বিবাদে শক্তি প্রদর্শনের পরিস্থিতিতে আসে সেক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থানের কোনো গুরুত্ব থাকে না।

(ii) **আয়তন ঃ-** একটি দেশের আয়তনের ওপর সেই দেশের জাতীয় শক্তি বহুলাংশে নির্ভরশীল বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য সেই দেশের ভূপ্রকৃতি ও খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি অনেক বিষয়ের ওপর শক্তিশীল জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

(iii) **ভূপ্রকৃতি ঃ-** ভৌগলিক উপাদানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল জনবসতির ঘনত্ব, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া, মাটির উর্বরতা প্রভৃতি। দেশের মধ্যে পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, মরুভূমি প্রভৃতির আধিক্য থাকলে দেশের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক যোগাযোগ ও জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

(iv) **জলবায়ু ঃ-** একটি দেশ শক্তিশালী জাতীয় রাষ্টর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে কি না তা বহুলাংশে নির্ভর করে তার জলবায়ুর ওপর। যেমন নাতিশীতোষ্ণ এলাকাই হল একটি দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির আদর্শ জলবায়ু।

(2) **প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ-** সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, প্রানীজ সম্পদ, মাটির উর্বরতা ইত্যাদিকে বোঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলে কোনো দেশ জাতীয় শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে কৃষিজ সম্পদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বেশি। কারণ রাষ্ট্র যদি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তাহলে জাতীয় শক্তি হিসাবে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। খাদ্যের পাশাপাশি রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নত ও সামরিক শক্তিসম্পন্নও হতে হবে। সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে রাষ্ট্র নিজেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

(3) **জনসংখ্যা ঃ-** দেশের জনসংখ্যা বেশি হলে সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো সম্ভবপর হয়। দেশের নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়।

কিন্তু গুণগত দিক বিচার করে বলা যায় দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে বা সম্পদ ব্যবহারের প্রকৃত মানসিকতা বা ক্ষমতা না থাকলে দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি, বেকারী

ইত্যাদি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(4) **শিল্পোন্নোতি ঃ-** বর্তমান পৃথিবীতে শিল্পায়নকে কোনো একটি দেশের অগ্রগতির সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। পামার ও পারকিন্‌স শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে জাতীয় সমৃদ্ধির অন্যতম উপাদান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মরগেনথাউ-এর বক্তব্য অনুযায়ী সামরিক দিক থেকে দেশকে শক্তিশালী করে প্রস্তুত করার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে ভারী শিল্পের বিকাশ অপরিহার্য।

(5) **সামরিক ব্যবস্থা ঃ-** জাতীয় শক্তি হিসাবে একটি দেশের অবস্থান সঠিক সামরিক প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল। যোগ্য নেতৃত্ব, যুদ্ধবিগ্রহ-সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রশিক্ষিত ও সক্ষম সামরিক বাহিনী জাতীয় শক্তির অন্যতম উপাদান। যদিও বর্তমানে মানবসমাজকে যুদ্ধ ধ্বংস ইত্যাদির থেকে সুরক্ষিত রাখতে 'পারমাণবিক অস্ত্র নিবৃত্তিকরণের নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়। তবু কোনো রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ না থাকলে সেই রাষ্ট্রের সুরক্ষা মজবুত থাকে না।

(6) **জাতীয় নেতৃত্ব ঃ-** সুযোগ্য, দূরদর্শী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতৃত্ব জাতীয় শক্তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সঠিক সমন্বয়সাধন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরতে পারেন। দেশের সরকার তথা নেতৃত্ব সুদক্ষ ও দূরদর্শী হলে প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও দেশের ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদির বিবেচনাপূর্বক সামর্থ্যের ভিত্তিতে এমন বৈদেশিক নীতি স্থির করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরতে পারে।

(7) **কূটনীতি ঃ-** হ্যান্‌স মর্গেনথাউ, কূটনীতিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য করে বলেছেন যে, কোনো দেশের সরকার যে পররাষ্ট্রনীতি স্থির করে তার সঠিক রূ পায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় কূটনীতিবিদদের ওপর। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের দেশের সম্পর্কের স্থায়িত্ব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের সরকারের গৃহীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির যথাযথ প্রচার ও বিশ্বজনমত গঠন, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা , অর্থনৈতিক, বাণিজ্যক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংযোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন ও প্রয়োজনীয় চুক্তির খসড়া তৈরি ও কার্যকরী করার ব্যবস্থা বহুলাংশে কূটনীতিকদের উপরেই নির্ভর করে। জাতীয় সরকারের দুর্বলতা দূর করতে সুদক্ষ কূটনীতিবিদরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

(8) **সামাজিক উপাদান ঃ-** একটি রাষ্ট্রের মধ্যে জাতপাতগত, উপজাতিগত, ধর্মগত বর্ণগত ও ভাষাগত নানা প্রকার সামাজিক উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তাই একটি যথার্থ শক্তিশালী দেশ হিসাবে তখনই আত্মপ্রকাশ করবে যখন সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ ওইসব কাঠামোর মধ্যে থেকেও জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেবে।

অথবা

জাতীয় স্বার্থের প্রকৃতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। জাতীয় স্বার্থরক্ষার বিভিন্ন উপায় উল্লেখ করো।

উঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম মৌলিক ধারণা হল জাতীয় স্বার্থ। সর্বপ্রকার জাতীয় মূল্যবোধের সমষ্টিকেই জাতীয় স্বার্থ বলা যায়। মরগেনথাউ ক্ষমতালাভ ও জাতীয় স্বার্থকে পরিপূরক বা অভিন্ন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বহু ও বিভিন্ন ধরনের বিষয়ীগত মতামত ও চিন্তাভাবনার মধ্যে দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশের মধ্যেও জাতীয়স্বার্থের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। জাতীয় স্বার্থের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়—জাতীয় স্বার্থ বলতে ''জাতির সেইসব ন্যূনতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহকে বোঝায়, যেগুলি রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।'' যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সেইসব ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ওইসব জাতীয় স্বার্থ ও সুরক্ষা বজায় রেখে একটি সহমতে পৌঁছতে চেষ্টা করে। তবে তা করার সময় সরকারকে সর্বতোভাবে জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা, জাতীয় উন্নয়ন, ঐতিহ্য ইত্যাদির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। ফ্র্যাঙ্কেলের মতে, জাতীয় স্বার্থ হল পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মুখ্য ধারণা। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মূল্যবোধের ধারণা পরিপূরক।

রাষ্ট্রগুলির সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির অন্যতম শর্ত হল শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা। সেজন্য প্রতিটি রাষ্ট্রকেই এমন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা উচিত যাতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক হিংসা, আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার পরিবর্তে একটি সমন্বয়মূলক শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

টমাস রবিনসনের মতে জাতীয় স্বার্থের প্রকৃতি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যায়।

(i) **মুখ্য জাতীয় স্বার্থ** – যেসব স্বার্থ সংরক্ষণ প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রে আবশ্যক। যেমন প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির সংরক্ষণ।

(ii) **গৌণ জাতীয় স্বার্থ –** গৌণ জাতীয় স্বার্থ বলতে বোঝায় যেসব জাতীয় স্বার্থ জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আবশ্যক না হলেও তা সংরক্ষণ করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যেমন অনাবাসী নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষা, ইত্যাদি।

(iii) **স্থায়ী ও জাতীয় স্বার্থ –** রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি অপরিবর্তনীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

(iv) **পরিবর্তনশীল জাতীয় স্বার্থ –** পরিবর্তনীয় জাতীয় স্বার্থ বলতে বোঝায় কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি জাতির যেসব স্বার্থ জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে বিশেষ

কার্যকরী সেইসব স্বার্থকে।

(v) **সাধারণ জাতীয় স্বার্থ –** সাধারণ জাতীয় স্বার্থের প্রধান উদাহরণ হল নিরস্ত্রীকরণ বা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা।

(vi) **সুনির্দিষ্ট জাতীয় স্বার্থ –** এইরূপ জাতীয় স্বাথের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

জাতীয় স্বার্থরক্ষার উপায়সমূহ –

(1) **কূটনীতি ঃ** জাতীয় স্বার্থরক্ষার অন্যতম প্রধান উপায় হল কূটনৈতিক কার্যকলাপ। নিজের দেশের বিদেশনীতিকে কূটনীতিবিদরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকার এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার কাজে সচেষ্ট থাকে। এ ব্যাপারে কূটনীতিকরা যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আপসরক্ষা, বিশ্বাসভাজন হওয়া এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের ঘোষণা। তাই পামার ও পারকিনস্ কূটনীতিবিদদের গুরুত্বকে বোঝাতে তাঁদের নিজ নিজ দেশের 'চক্ষু ও কর্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

(2) **প্রচার ঃ** জতীয় স্বার্থরক্ষার অন্যতম মাধ্যম প্রচার-কে হাতিয়ার করে একটি দেশ তার পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যথাঃ দূরদর্শন, বেতার, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে।

(3) **অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণদান ঃ** জাতীয় স্বার্থরক্ষার উপায় হিসাবে উন্নত ও সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সহযোগ ও ঋণ প্রদান করে। বিনিময়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি সাহায্যগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির অখণ্ড সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে।

(4) **জোট গঠন ঃ** সাধারণ স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই বা অধিক রাষ্ট্রগুলি জোট গঠন করে থাকে। রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জোট গঠিত হয়। তেমনি একটি রাষ্ট্রজোটের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অন্য রাষ্ট্রজোটও গঠিত হয়।

(5) **বলপ্রয়োগ ঃ** জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রগুলি শক্তিপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন করে থাকে। বিশ্বের সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বার্থ তথা বাণিজ্যিক স্বার্থকে বিস্তৃত করার জন্য অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। দরিদ্রদেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করে সমরাস্ত্র বিক্রির পথ পরিষ্কার করে।

(b) কার্ল মার্কস-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বটি আলোচনা করো।

উঃ মার্কবাদের অন্যতম মৌলিক উপাদান ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অর্থ হল মানুষের বিকাশ এবং মানবসমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকাশের ইতিহাসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ।

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ সহ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা স্বাভাবিক। তাই উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন পদ্ধতির ওপর সমাজের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্ভরশীল। মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করে মার্কস প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের আবশ্যিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মানবসমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সমাজের মূল ভিত হল অর্থনীতি এবং আইন, ধর্ম ও সাহিত্য প্রভৃতি দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভিতের ওপরে।

উৎপাদনের দুটি দিক তথা উপাদান হল দুটি যথা– প্রকৃতি এবং শ্রমশক্তি। উৎপাদনের অর্থ হল মানুষের সামাজিক উৎপাদন। উৎপাদন পদ্ধতির ও দুটি দিক আছে যথা উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন শক্তি বলতে বোঝায় শ্রমিক ও তার শ্রমক্ষমতা, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। আর উৎপাদন সম্পর্ক বলতে বোঝায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রেণিতে শ্রেণিতে উৎপাদনভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্ককে।

সমাজের পরিবর্তনের কারণ ঃ মার্কসের মতে উৎপাদনকার্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সংগতি বজায় থাকার ফলে। কিন্তু ধারাবাহিক বিকাশের ফলে উৎপাদন শক্তির অগ্রগতি দেখা দিলে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংগতি নষ্ট হয় এবং এর ফলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ উৎপাদনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল গতিশীলতার উৎপাদন কখনো অনেককাল একজায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। স্তালিনের মতে, বাস্তবভিত্তিক ঐতিহাসিক চর্চায় উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নিয়ম ও সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলির বিশ্লেষণ করা এবং প্রচার করা।

উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন শক্তির সক্রিয়তা ও বৈপ্লবিক গতি। মার্কসের মতানুযায়ী, অগ্রগতির একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাজে বস্তুত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধের শুরুতে উৎপাদন সম্পর্ক বিকশিত উৎপাদন শক্তির কিছু অংশকে সাময়িকভাবে ধ্বংস করে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। ক্রমে উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে উৎপাদন উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

উৎপাদনের তৃতীয় পর্যায় বা বৈশিষ্ট্য হল পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটে এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তবে সমাজ বিবর্তনের কোনো স্তরেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন বিনা সংঘর্ষে ঘটে না। প্রতি স্তরেই শ্রেনিদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অগ্রগতি সাধিত হয়। এইভাবেই আদিম সমভোগবাদী সমাজ থেকে দাস সমাজ, সামন্ত-সমাজ ও পুঁজিবাদী-সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছেন এভাবেই মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমাজ বিবর্তনের ধারাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

(c) বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা বলতে কী বোঝ? বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা কীভাবে সংরক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করো।

উঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লর্ড ব্রাইসের মতে ''বিচার বিভাগের যথাযথ সমীক্ষার ওপরেই সরকারের উৎকর্ষতার বিচার হয়'' নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য।

বিচারবিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সরকারি আইন, আদেশ ও নির্দেশের বৈধতা বিচার করা। যেক্ষেত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট আইন, আদেশ বা নির্দেশের প্রকৃতি সংবিধান বিরোধী, সেক্ষেত্রে ওই আইন, আদেশ বা নির্দেশকে বিচারবিভাগ বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে বিচারবিভাগ সংবিধানের উদ্দেশ্য ও মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে।

ল্যাস্কির মতে, বিচারকার্য পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিচারবিভাগ একটি রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্র অনুধাবন করে। এছাড়া বিচারবিভাগ আইনি ন্যায়বিচার ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। অনেক সময় প্রচলিত আইনের বাইরে গিয়ে বিচারকরা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি, সমকালীন স্বাভাবিক ন্যায়নীতির ওপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিচারকদের এইসব সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অনুরূপ কোনো মামলায় আইন হিসাবে পরিগণিত হয়।

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে বিচারবিভাগের ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আইন ও শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করে বিচারবিভাগ।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ঃ

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভরশীল—

(1) **বিচারপতিদের যোগ্যতা ঃ**- সৎ, সাহসী ও নিরপেক্ষ, আইনজ্ঞ বিচারপতি দৃঢ়তার সঙ্গে বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকেন। দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা যদি বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

(2) **বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতি ঃ**- বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতির ওপরেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসারে বিচারপতিরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

(i) **জনগণ কর্তৃক নির্বাচন ঃ-** অনেকের মতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিচারকগণ নির্বাচিত হয়ে আসার কথা বলেন। কিন্তু গার্নার, ল্যাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেছেন যে (a) জনগণ তাৎক্ষণিক আবেগ ও দলীয় প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে পারেন (b) পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার

আগ্রহে তাঁরা নৈতিকতা বিসর্জন দিতে পারেন। (c) জনপ্রিয় কোনো ব্যক্তিত্ব সুবিচারক হবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। (d) নির্বাচনী ব্যবস্থার দ্বারা নির্বাচিত বিচারপতি কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট হলে তাঁর পক্ষে পক্ষপাতহীন বিচারকার্য অসম্ভব।

(ii) **আইন বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন ঃ**- আইনসভার দ্বারা বিচারপতিদের নির্বাচনকে অনেকে গণতন্ত্র ও বিধিসম্মত বলে দাবী করেন। সুইৎজারল্যাণ্ড, বলিভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে এই পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ ও নিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। তার কারণ (a) এই পদ্ধতিতে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থীরাই বিচারক পদে নির্বাচিত হন। স্বভাবতই তাঁরা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থেকে পক্ষপাতমূলক বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন। (b) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা নিজ দলের সমর্থক কাউকে বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত করলে অনেক সময় যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারপতিরা নির্বাচিত হতে পারেন না।

(iii) **শাসন বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন ঃ**- শাসন বিভাগের দ্বারা বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিকে অনেকে অপেক্ষাকৃত ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করেন। তবে এই পদ্ধতিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ল্যাস্কিও অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, শাসন বিভাগের প্রস্তাব বরিষ্ঠ বিচারপতিদের প্রতিনিধিদের গঠিত স্থায়ী কমিটির অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ পদ্ধতিতে উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। তবে এই পদ্ধতিতেও যথেষ্ট নিরপেক্ষতা বজায় রাখা প্রয়োজন কারণ— (a) শাসনবিভাগের দ্বারা নিযুক্ত বিচারপতিরা অনেক সময় শাসনবিভাগের সপক্ষে বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকেন। (b) অবসরের পর শাসন বিভাগীয় কোনো পদে ভবিষ্যতে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকলে নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার অনেক সময় ব্যহত হয়।

বিচারপতির কার্যকাল ঃ-

বিচারবিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত হল বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব। বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব যদি নির্দিষ্ট না থাকে বা স্বল্পকালীন হয় তাহলে তাঁদের দৃঢ়তার সঙ্গে ন্যায়বিচার করা সম্ভবপর হয় না। বিচারপতিরা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার প্রতিফলন তাঁদের বিচারকার্য করতে পারেন। কার্যকাল দীর্ঘ না হলে বিচারপতিরা দুর্নীতিপরায়ণও হতে পারেন। তাই বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রেই বিচারপতিদের কার্যকালের একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা নির্ধারিত আছে।

বিচারপতিদের অপসারণ ঃ-

আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ বা জনসাধারণ যদি খুব সহজেই বিচারপতিদের তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারে তাহলে কোনো বিচারকের পক্ষেই নির্ভীক নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই শুধু প্রমাণিত দুর্নীতি, অক্ষমতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি গুরুতর কারনেই একটি বিশেষ সাংবিধানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই বিচারপতিদের অপসারনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ঃ-

বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা কম হলে তাঁদের দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। বেতন, ভাতা ইত্যাদি যথেষ্ট না হলে অনেক যোগ্য আইনজীবী বিচারক পদে যোগ দিতে আগ্রহী হবেন না। সুযোগ্য বিচারপতি না থাকলে জটিল ও সংবিধান সম্পর্কিত মামলার সুমীমাংসা যথাযথ হয় না।

বিচারবিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ ঃ-

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল বিচারবিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা। ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসাবে বিচার বিভাগকে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা প্রয়োজন। ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখতে হলে বিচারবিভাগের স্বতন্ত্র অবস্থান অবশ্যই প্রয়োজন।

অথবা

এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দাও।

উঃ আইনসভার গঠন এককক্ষবিশিষ্ট না দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হওয়া উচিত তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আবেসিয়ে, বেন্থাম, ল্যাস্কি, ফ্রাংকলিন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে মত দিয়েছেন।

সপক্ষে যুক্তি ঃ-

(1) **গণতান্ত্রিক ঃ-** আইনসভা জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ গণতন্ত্র হল জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইনসভার প্রতিটি কার্যকলাপ আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির উপর নির্বাচকদের আগ্রহ ও দৃষ্টি থাকে বলে আইনসভা সর্বদা জনস্বার্থ রক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়।

(2) **দায়িত্ব নির্ধারণ সহজ ঃ-** আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট হলে সেই আইনসভা নিজ কার্যাবলী সম্পর্কে দায়িত্ব সচেতন হয়। এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও তাঁদের দায়িত্ব পালনে আন্তরিক থাকেন।

(3) **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ**- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় জরুরী বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। দীর্ঘসূত্রতার ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(4) **ব্যয়বহুল নয় ঃ**- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা শুধুমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত হয়। অন্যদিকে আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে সাধারণত নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতৃস্থানীয়রাই উচ্চকক্ষে মনোনীত হন। ফলে একই দলের সদস্যরাই দুটি কক্ষে থাকায় নিম্নকক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিরোধিতা করেন না। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকলে সদস্যদের বেতন, ভাতা, রক্ষণাবেক্ষণ নানাবিধ কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। তাই এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যয়বহুল নয়।

(5) **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুপন্থী ঃ**- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম শর্ত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা বণ্টনের ফলে রাজ্যগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। ল্যাস্কি বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত চরিত্রের মধ্যেই অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

(6) **সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন ঃ-** দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়– এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ একটি বিলকে আইনে রূপান্তরিত করতে গেলে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে আসতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ে বিলটিকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। বিলের ওপর আলোচনা, বিতর্ক প্রচারমাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে প্রকাশ পায় এবং বিলের পক্ষে বিপক্ষে জনমত সংগঠিত হয়। ফলে জনমতের দিকে ভারসাম্য রেখেই একটি বিল আইনে পরিণত হয়। এভাবেই এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সুচিন্তিত আইন প্রণীত হতে পারে।

(7) **এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই কাম্য ঃ**- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবক্তাদের মতে, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার দুটি কক্ষে একই রাজনৈতিক দল বা জোটের সদস্যদের গরিষ্ঠতা থাকলে নিম্নকক্ষ জনস্বার্থবিরোধী কোনো আইন পাশ করলেও উচ্চকক্ষ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নিম্নকক্ষের প্রণীত আইনকেই সমর্থন জানায়। আবার সমক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কক্ষ থাকলে এবং দুটি পরস্পরবিরোধী দলের গরিষ্ঠতা থাকলে তীব্র মতবিরোধের ফলে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে, ফলে জনস্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আবেসিয়ের মন্তব্য, ''দ্বিতীয় কক্ষ যদি প্রথম কক্ষের সঙ্গে একমত হয়। তাহলে তা অনাব্যশক; আর যদি দ্বিমত পোষণ করে, তবে তা ক্ষতিকারক।'' এইসব নানাবিধ কারণে এককক্ষ বিশিষ্ট আঙ্গ ইনসভাই কাম্য বলে মনে করা হয়।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয় সেগুলি হল—

(1) **স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন ঃ**- একক্ষকবিশিষ্ট আইনসভা থাকলে একটিমাত্র কক্ষই আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হয়। ফলে উচ্চকক্ষ না থাকায় নিজেদের ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন করতে পারে যা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী ও দলীয় স্বার্থের অনুপন্থী হতে পারে, যা অগণতান্ত্রিক।

(2) **সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন অসম্ভব ঃ**- সুচিন্তিত ও জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়নে এককক্ষবিশিষট আইনসভা কার্যকরী নয়। অনেক সময় দলীয় স্বার্থ, ভাবাবেগ ও উত্তেজনা কিংবা তাৎক্ষণিক জনমতের চাপে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণীত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে লেকির অভিমত হল। দ্বিতীয় কক্ষের উপস্থিতি সংযতকারী, নিয়ন্ত্রণমূলক ও পুণবিবেচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

(3) **পরিবর্তনশীল জনমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনতা ঃ**- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত সর্বদা পরিবর্তনশীল সেক্ষেত্রে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় সদস্যরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (৪ কিংবা ৫ বছর) নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ফলে নির্বাচন পরবর্তী জনমতের কোনো প্রতিক্রিয়া এইরূপ আইনসভায় প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই জন্য পরিবর্তিত জনমতের সঙ্গে সাযুজ্য রাখার জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজন।

(4) **সংখ্যালঘু স্বার্থের পরিপন্থী ঃ**- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলে অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আইনসভায় নির্বাচিত হতে পারেন না। ফলে আইনসভায় তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাদের দাবিদাওয়াজনিত স্বার্থের পক্ষে জানাবার সুযোগ থাকে না।

(5) **সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা ঃ**- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি অনেক বর্ধিত হয়েছে। নাগরিক পরিসেবার দায়িত্ব ও পরিধিত সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের আইনসভার কাজও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ব্যতীত নানাবিধ বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও জনকল্যাণমুখী নীতির বাস্তবায়ন অসম্ভব।

(6) **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে উপযোগী নয় ঃ**- যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মধ্যে। সেক্ষেত্রে আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট হলে আঞ্চলিক স্বার্থ যথাযথ গুরুত্ব পায় না। তাই যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই কাম্য।

(7) **সমাজতন্ত্রবাদীদের অভিমত ঃ**- সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা মনে করেন একটি রাষ্ট্রে বসবাসকারী বহু জাতির অবস্থান – যাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রয়েছে। এই নানাভাষা নানা মতাবলম্বী জাতিসমূহের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট

আইনসভার প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষেই তাঁরা যুক্তি দেন।

(d) অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যাখ্যা করো।

উ: রাজ্যপাল হলেন রাজ্যের শাসন বিভাগের প্রধান। রাজ্য সরকারের যাবতীয় কাজ রাজ্যপালের নামেই পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল ৫ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ-

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাগে আলোচনা করা যায়—

(1) **শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** তত্ত্বগতভাবে রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে। রাজ্যের সকল প্রশাসনিক কার্য তাঁর নামেই সম্পাদিত হয়। রাজ্যের শাসনভার সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি নিয়মাবলী তৈরি করে থাকেন। নির্বাচনের পর বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ ও দপ্তর বণ্টন করেন। পরিস্থিতি সাপেক্ষে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীদের পদচ্যুত করতে পারেন। এছাড়া রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য সহ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ করতে পারেন। এছাড়া, সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে মনে করলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির সুপারিশ করতে পারেন। রাজ্যপাল রাজ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসাবে কাজ করেন।

(2) **আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** রাজ্যপাল আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যপালের আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল—রাজ্য আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হলে উচ্চকক্ষ বিধানপরিষদে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রের গুণীব্যক্তিদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মনোনীত করা। বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে একজনকে মনোনীত করতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যবিধানসভার অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত রাখতে পারেন। প্রয়োজনে বিধানসভা ভেঙে দিতেও পারেন। আইনসভার কক্ষে ভাষণ দিতে পারেন (দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উভয় কক্ষে)। নির্বাচনের পরে বিধানসভায় প্রতি বছর প্রথম অধিবেশনে সরকারের লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না। অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন। তবে, রাজ্য আইনসভায় পুনরায় সংশ্লিষ্ট বিল পাশ হলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। রাজ্যবিধানসভায় গৃহীত কোনো বিলের ব্যাপারে আইনি

জটিলতা থাকলে তিনি তা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। রাজ্য আঞ্চ ইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীয় জরুরি প্রয়োজনে তিনি 'অর্ডিন্যান্স জারি' করতে পারেন।

(3) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ**- রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া রাজ-আইনসভায় অর্থবিল উস্থাপন করা যায় না। রাজ্যের বাজেট তিনি অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে আইনসভায় উত্থাপন করেন। রাজ্যের আকস্মিক ব্যয় তহবিল এর দায়িত্ব ও রাজ্যপালের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে।

(4) **বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ**- রাজ্যপালের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। রাজ্যের দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি, অতিরিক্ত জেলা জজ, দায়রা জজ প্রমুখকে রাজ্যপাল নিয়োগ করে থাকেন এবং এঁদের বদলি, পদোন্নতির ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর শাস্তিমুকুব বা হ্রাস করার ক্ষমতা তাঁর আছে। তবে মৃত্যুদণ্ড তিনি হ্রাস করতে পারেন না।

(5) **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ঃ**- রাজ্যপালের স্বেচ্ছধীন ক্ষমতা হল এমন এক বিশেষ ক্ষমতা যা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য নন। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর সিদ্ধান্তের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন তোলা যায় না। সংবিধানে যেসব ক্ষেত্রে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ রাষ্ট্রপতি রাজ্যের রাজ্যপালকে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কোনো কোনো অঞ্চলের স্বতন্ত্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দায়িত্ব দিতে পারেন। নাগা বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ দমনের জন্য রাজ্যপালের বিশেষ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে। উপজাতি অঞ্চল সমূহের কিছু নির্দিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্ব তার হাতে রয়েছে ইত্যাদি।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ, মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট প্রদান, পরিস্থিত সাপেক্ষে বিধানসভার অধিবেশন ডাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ প্রভৃতি ও তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অঙ্গ।

পদমর্যাদা ঃ- সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালকে রাজ্যের প্রধান শাসক বলা হলেও কার্যত তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবেই গণ্য হন। সংবিধানে রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর চতুর্থ নির্বাচনের পরবর্তী সময় থেকে লক্ষ্য করা যায় কেন্দ্রের শাসকদলের সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে অস্থির করা, সরকার ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিধানসভায় স্পষ্ট গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে রাজপাল

নির্বাচিত সরকার ভেঙে দিয়েছে ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চরিত্র ক্ষুন্ন হয়েছে। রাজ্যসরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন রাখার জন্যই হয়ত সংবিধানে এরূপ ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। তবে রাজ্যপাল যদি শিক্ষিত, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিচক্ষণ হন তাহলে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ না করেও মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আদায় করতে পারেন।

(e) ভারতের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।

উ: ভারতের বিচার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ-

(1) **অখণ্ড বিচারব্যবস্থা ঃ-** সুপ্রিম কোর্ট হল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ও সর্বোচ্চ আপিল আদালত। অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টসমূহ সুপ্রিম কোর্টের অধীনে থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করে। আবার হাইকোর্টের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত সমূহ। ড: আম্বেদকর গণপরিষদে উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও দ্বৈত-বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সামরিক আদালত ইত্যাদি গঠিত হয়।

(2) **অভিন্ন বিধি ঃ**-সমগ্র ভারতবর্ষে একই ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদিত হয়। অঙ্গরাজ্যের জন্য পৃথক কোনো আইনব্যবস্থা নেই।

(3) **প্রশাসনিক আদালের অবস্থিতি ঃ**- সংসদ আইন প্রণয়ন করে সরকারি কর্মচারী, স্থানীয় স্বংস্থা বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদিগের চাকুরি সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে। এছাড়া শিল্প, ভূমিসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে।

(4) **আদালতের সীমাবদ্ধতা ঃ-** 'আইনের দৃষ্টিতে সমতার' নীতির কথা বলা হলেও সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালেরা স্বপদে থাকাকালীন যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার জন্য আদালতের কাছে কোনোরূপ জবাবদিহি করতে হয় না। স্বপদে থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। বিদেশি রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ ও রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মচারিদের অপরাধের বিচার ভারতীয় আদালতে হয় না। ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি সংকুচিত হয়েছে।

(5) **দুর্বল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ঃ**- সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী নয়। যদিও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পার্লামেন্ট প্রণীত কোনো আইনকে সংবিধান-বিরোধী মনে করলে খারিজ করে দিতে পারে কিন্তু আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো আইন 'স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধের' বিরোধী কিনা তা বিচার করতে পারে না। পার্লামেন্ট নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও গরিষ্ঠতায় আইন পাশ করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও বাতিল করতে পারে। জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকার রক্ষায় সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

(6) **শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ঃ**- যদিও ভারতে বিচারবিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে যুক্তরাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শাসন বিভাগ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন ১৯৭৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শে বরিষ্ঠ বিচারপতিদের উপেক্ষা করে এ. এন. রায়কে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

(7) **বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ঃ**- বিচারপতিরা যাতে নিরপেক্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য ভারতীয় সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন তাঁদের পদচ্যুতি, বিচারপতিদের রায়ের চূড়ান্ত মান্যতা, অবসর গ্রহনের পর আইনজীবী হিসাবে কাজ না করা ইত্যাদি। তবু ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী সরকার চাইলে রাজনৈতিক কারণে পার্লামেন্টে ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে অবসরের পরে বিচারপতিরা রাজ্যপাল, রাষ্ট্রদূত, আইনসভার সদস্য পদে নিযুক্ত হওয়ার বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

(8) **দরিদ্রের স্বার্থের পরিপন্থী ঃ-** সরকারি আনুকূল্যে মামলা চালানোর কোনো ব্যবস্থা ভারতে নেই। তাই দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মামলা চালানো সম্ভব হয় না। তাই বিত্তশালী অপরাধী ব্যক্তিরা অর্থের জোরে নামী আইনজীবী নিয়োগ করে মামলায় জয়লাভ করে। যদিও দরিদ্রব্যক্তিদের সাহায্যের ঘোষণা ৪২তম সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এটি নির্দেশমূলক নীতির অর্ন্তভূক্ত থাকায় এটি কার্যকর করতে সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

অথবা

ক্রেতা সুরক্ষা আদালত একটি টীকা লেখো।

উ: ক্রেতা সুরক্ষা আদালতকে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক আদালত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ক্রেতা আদালত উপভোক্তাদের অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য গঠিত হয়েছে। তিনটি স্তর বিশিষ্ট ক্রেতা আদালতের বিবরণ হল এইরূপ ঃ-

(1) **জেলাস্তর ঃ-** ত্রিস্তরবিশিষ্ট ক্রেতা আদালতের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে জেলা আদালত। জেলা আদালতগুলি গঠিত হয় একজন বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক অথবা বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যিনি জেলা আদালতের সভাপতি হিসাবে কাজ করবেন এবং একজন মহিলা সহ আরোও দুজন সদস্য থাকবেন।

জেলা আদালতের সদস্য হতে গেলে যোগ্যতা হল-ব্যক্তিকে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে-স্নাতক হতে হবে- অর্থনীতি, আইন, বানিজ্য, সরকারি বিষয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। রাজ্যসরকার কর্তৃক গঠিত একটি নির্বাচন কমিটি সংশ্লিষ্ট আদালতের সদস্যদের ও সভাপতিকে নিয়োগ করে। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত (যেটি আগে ছিল)।

জেলা আদালতের এক্তিয়ার ঃ- ভোগ্যপণ্যের মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সর্বমোট অনধিক ২০ লক্ষ টাকা দাবি নিয়ে ক্রেতারা জেলা আদালতে যেসব অভিযোগ দায়ের করেন সেগুলি এই আদালত বিচার করে থাকে।

(2) **রাজ্যস্তর ঃ-** ক্রেতা আদালতের মধ্যবর্তী স্তর হল রাজ্যস্তর। যা রাজ্য কমিশন নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে আদালতের একজন বর্তমান বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া দুই বা ততোধিক সদস্য (অবশ্যই একজন মহিলা সহ) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানেও সদস্য জেলাস্তরের বিচারকদের ন্যায় যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন এবং ৫ বছর বা ৬৭ বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন (যেটি আগে শেষ হবে)।

এক্তিয়ার ঃ- ১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সেইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাতে পারবে যে পরিষেবার মূল্য ২০ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু ১ কোটি টাকার কম; রাজ্যে অবস্থিত জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।

(3) **জাতীয় ক্রেতা আদালত ঃ-** ক্রেতা আদালতের সর্বোচ্চ স্তরটি হল জাতীয়স্তর। যাকে 'জাতীয় কমিশন' বলা হয়। সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় কমিশন রয়েছে।

জাতীয় কমিশনের গঠন ঃ- সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে আদালতের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় কমিশনের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। এছাড়া কমপক্ষে ৪ জন বা ততোধিক সদস্য (একজন মহিলা সহ) নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কমিশনের বাকী সদস্যরা নিযুক্ত হন। যোগ্যতা জেলা ও রাজ্যস্তরের সদস্যদের ন্যায় আবশ্যিক। জাতীয় আদালতের সদস্যগণ ৫ বছর বা ৭০ বছর (যেটি আগে হবে)।

এক্তিয়ার ঃ- 'ক্রেতা সুরক্ষা আইন' অনুযায়ী কমিশনের এক্তিয়ার হল—ভোগ্যপণ্যের মূল্য ও ক্ষতিপূরণের দাবি যদি ২০ লক্ষ টাকার বেশি হয় এবং রাজকমিশনের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।

ক্রেতা আদালতের বৈশিষ্ট্য ঃ-ক্রেতা আদালতের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(i) ক্রেতা আদালত শুধুমাত্র ক্রেতাবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত ১৯৮৬ সালে যে আঙ্ক ইনের দ্বারা এই আদালতের সৃষ্টি সেখানে স্পষ্ট বলা আছে এই আইনের লক্ষ্য ক্রেতার সুরক্ষা।

(ii) ক্রেতা আদালত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। এখানে শুধুমাত্র ক্রেতার অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযোগ গ্রহণ করা হয়।

(iii) ক্রেতা আদালতে ক্রেতাদের ক্রয় করা জিনিস নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি অর্থের বিনিময়ে যে সব পরিষেবা গ্রহণ করেন তাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। চিকিৎসা পরিষেবা ও ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের অন্তর্ভুক্ত।

(iv) ক্রেতা আদালতে উপভোক্তারা স্পল্প ব্যয়ে সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন।

(v) এই আদালতে অভিযোগ জানানোর জন্য কোনো আইনজীবীর প্রয়োজন হয় না। তবে ক্রেতা চাইলে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন।

(vi) ক্রেতা আদালতের তিনটি স্তরের আদেশই আপিল যোগ্য। জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যস্তরে। রাজ্যস্তরের রায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রেতা আদালতে এবং জাতীয় ক্রেতা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়।

(vii) ক্রেতা আদালতে কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা চলাকালীন প্রয়োজনে দেওয়ানি কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি ও ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যায়।

১৯৮৬ সালের ক্রেতা সুরক্ষা আইন ও তার সংশোধনী পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ভারতসরকার বা রাজ্যসরকারগুলি ক্রেতা সাধারণের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ক্রেতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও গড়ে উঠেছে। কিন্তু ক্রেতাদের সচেতনতার অভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে গ্রামের ক্রেতা সাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও উদাসীনতা বেশি লক্ষ করা যায়। অতএব ক্রেতা সুরক্ষা আন্দোলনকে ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত করে সর্বস্তরের গ্রাহক ও ক্রেতাকে আরোও সচেতন করে তোলাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

Part- B

1. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : 1 × 24 = 24

(i) প্রক্সি যুদ্ধ কৌশলটি ব্যবহৃত হয়েছিল

(a) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (b) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

(c) ঠান্ডা লড়াইয়ে (d) ভারত-পাক যুদ্ধে

উ: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

(ii) জোট নিরপেক্ষতা আন্দোলনের একটি অপরিহার্য নীতি হল

(a) হস্তক্ষেপ (b) হস্তক্ষেপ না করা

(c) আগ্রাসন (d) সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি

উ: হস্তক্ষেপ না করা

(iii) একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের প্রধান দেশ হল

(a) আমেরিকা (b) গ্রেট ব্রিটেন

(c) চীন (d) ফ্রান্স

উ: আমেরিকা

(iv) পঞ্চশীল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন সালে?

(a) 1968 (b) 1972

(c) 1954 (d) 1990

উ: 1954

(v) ভারতে 1991 সালে কোন প্রধানমন্ত্রীর সময় বাজার অর্থনীতির সূচনা ঘটে?

(a) জওহরলাল নেহেরু (b) ইন্দিরা গান্ধী

(c) নরসিমা রাও (d) মনমোহন সিং

উ: নরসিমা রাও

(vi) 123 Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছিল

(a) 2005 সালে (b) 2007 সালে

(c) 2008 সালে (d) 2013 সালে

উ: 2007 সালে

(vii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল

(a) 191 (b) 192

(c) 204 (d) 193

উ: 193

(viii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্ধআইনসভা হল

(a) সাধারণ সভা (b) নিরাপত্তা পরিষদ

(c) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (d) কর্মদপ্তর

উ: সাধারণ সভা

(ix) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতির সংখ্যা হল

(a) 9 জন (b) 10 জন

(c) 15 জন (d) 16 জন

উ: 15 জন

(x) UNO-র প্রথম মহাসচিব হলেন

(a) কোফি আন্নান (b) বান কি-মুন

(c) ট্রিগভি লি (d) উ থান্ট

উ: ট্রিগভি লি

(xi) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটির মুখ্য প্রবক্তা কে?

(a) মঁতেস্কু (b) ব্ল্যাকস্টোন

(c) বার্কার (d) ডাইসি

উ: মঁতেস্কু

(xii) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নিম্ন কক্ষের নাম হল

(a) জনপ্রতিনিধি সভা (b) লোকসভা

(c) বিধানসভা (d) সিনেট

উ: জনপ্রতিনিধি সভা

(xiii) "দ্বিতীয় পরিষদ হল স্বাধীনতার অপরিহার্য নিরাপত্তা" — একথা বলেছেন

(a) লর্ড কার্জন (b) লর্ড অ্যাক্টন

(c) অ্যারিস্টটল (d) গেটেল

উ: লর্ড অ্যাক্টন

(xiv) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে বলা হয়

(a) কংগ্রেস (b) ডুমা

(c) পার্লামেন্ট (d) শোরা

উ: কংগ্রেস

(xv) একক পরিচালকের একটি উদাহরণ হল

(a) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (b) সুইৎজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

(c) ভারতের রাষ্ট্রপতি (d) ব্রিটেনের রাজা বা রানি

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি

(xvi) আমলাতন্ত্র হল ..... শাসন।

(a) স্থায়ী (b) অস্থায়ী

(c) একক (d) বহু

উ: স্থায়ী

(xvii) ভারতের রাষ্ট্রপতি ..... ধরনের জরুরী অবস্থা জারি করতে পারেন।

(a) এক (b) দুই

(c) তিন (d) চার

উ: তিন

(xviii) ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিযুক্ত করেন

(a) রাষ্ট্রপতি (b) প্রধানমন্ত্রী

(c) প্রধান বিচারপতি (d) উপরাষ্ট্রপতি

উ: রাষ্ট্রপতি

(xix) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা দায়িত্বশীল থাকে

(a) পার্লামেন্টের কাছে (b) লোকসভার কাছে

(c) রাজ্যসভার কাছে (d) সুপ্রীম কোর্টের কাছে

উ: পার্লামেন্টের কাছে

(xx) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক লোকসভায় কতজন সদস্য মনোনীত হন?

(a) 2 জন (b) 3 জন

(c) 4 জন (d) 5 জন

উ: 2 জন

(xxi) পঞ্চায়েত সমিতি হল পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার ..... স্তর।

(a) প্রথম (b) দ্বিতীয়

(c) তৃতীয় (d) চতুর্থ

উ: দ্বিতীয়

(xxii) ..... তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(a) 70 (b) 71

(c) 72 (d) 73

উ: 73

(xiii) জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রধান হলেন

(a) বি. ডি. ও. (b) এস. ডি. ও.

(c) ডি. এম. (d) সভাধিপতি

উ: সভাধিপতি

(xxiv) পশ্চিমবঙ্গে পৌর আইন প্রণীত হয় ..... সালে।

(a) 1992 (b) 1993

(c) 1994 (d) 1995

উ: 1993

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) 'দেতাঁত' ও ঠান্ডা লড়াই-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী ?

উ: 'দেতাঁত' বলতে বোঝায় দুটি রাষ্ট্রশক্তির মধে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে 'ঠান্ডা লড়াই' হল প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পরিবর্তে যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। অন্যভাবে বলা যায় 'মতাদর্শগত যুদ্ধ।

(ii) দ্বিমেরুকেন্দ্রিক রাজনীতি বলতে কি বোঝায় ?

উ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে দুটি মেরুতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থাকেই দ্বিমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বরাজনীতি বলে।

(iii) জোট নিরপেক্ষ মতাদর্শ কোন ভারতীয় রাষ্ট্রনেতার মস্তিষ্কপ্রসূত?

উ: জওহরলাল নেহেরু

অথবা

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য কী?

উ: সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও পঞ্চশীল নীতি অনুসরণ।

(iv) ভারতের বিদেশনীতির প্রধান স্তম্ভ কী?

উ: ভারতীয় বিদেশনীতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জোট নিরপেক্ষতা।

(v) একটি 'পঞ্চশীল' নীতির উল্লেখ করো।

উ: একটি পঞ্চশীল নীতি হল 'অনাক্রমণ'।

অথবা

'পঞ্চশীল' নীতি কে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন?

উ: 'পঞ্চশীল' নীতি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন জওহরলাল নেহেরু।

(vi) CTBT কী?

উ: Comprehensive Test Ban Treaty. পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি (1996)

(vii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে কতগুলি ধারা?

উ: 111টি ধারা আছে

(viii) নিরাপত্তা পরিষদে কোন কোন দেশের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা আছে?

উ: ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিক, রাশিয়া ও চীন।

অথবা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি কাজ উল্লেখ করো।

উ: কৃষি ও খাদ্যের উন্নতিকল্পে এই সংস্থা গবেষণা চালাবার ব্যবস্থা করতে পারে।

(ix) জাতিপুঞ্জের মহাসচিব কীভাবে নির্বাচিত হন?

উ: নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্য সহ অন্তত নয় জন সদস্যের সমর্থনে নিধারিত প্রার্থী নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জাতিপুঞ্জের মহাসচিব নির্বাচিত হন।

অথবা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তা নীতি কী?

উ: জাতিপুঞ্জের সনদের প্রথম ধারায় বলা হয়েছে যে, বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা করার জন্য প্রয়োজনে যৌথ নিরাপত্তা নীতি প্রয়োগ করা যাবে। যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার লক্ষ্য হল বৃহত্তর বিপর্যয় এড়াবার জন্য সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে যৌথভাবে প্রতিরোধ করা।

(x) UNESCO কী?

উ: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা। এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্যারিসে অবস্থিত।

(xi) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে একটি যুক্তি দাও।

উ: আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হলে উভয় কক্ষে আলাপ-আলোচনা এবং তর্কবিতর্কের মাধ্যমে সুচিন্তিত ও জনকল্যাণকামী আইন প্রণীত হতে পারে।

অথবা

'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন'-এর সংজ্ঞা দাও।

উ: অনেক সময় আইনসভা কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব শাসন বিভাগের হাতে অর্পণ করে। সেই ক্ষমতাবলে শাসন বিভাগ প্রণীত আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন' বলে।

(xii) রাষ্ট্রকৃত্যক বা আমলা কাদের বলা হয়?

উ: রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীরা হলেন শাসনবিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ। তাঁরা রাষ্ট্রকৃত্যক নামে পরিচিত। সাধারণভাবে এঁদের আমলা বলা হয়।

(xiii)ভারত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান কে?

উ: ভারত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রধান হলেন 'রাষ্ট্রপতি'।

অথবা

রাজ্য আইনসভার নেতা কে?

উ: রাজ্য আইনসভার নেতা হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

(xiv) ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করো।

উ: মুখ্যমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রাজ্য বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা, প্রয়োজনে ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া।

(xv) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় কে সভাপতিত্ব করেন?

উ: গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় 'প্রধান' সভাপতিত্ব করেন।

অথবা

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য কত আসন সংরক্ষিত থাকে?

উ: মহিলাদের জন্য 50% আসন সংরক্ষিত।

(xvi)পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির আয়ের একটি উৎস উল্লেখ করো।

উ: সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সাহায্য।

অথবা

জেলা সংসদের প্রধান কাজ কী উল্লেখ করো।

উ: প্রতিবছর জেলা সংসদের অন্তত দুটি বৈঠক আহ্বান করে সেখানে যাবতীয় হিসাব, বাজেট ও অডিট রিপোর্ট পেশ।

Political Science

2017

PART - A (30 Marks)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ-

(1) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা লেখো। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশের ধারা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উ: বর্তমান পৃথিবীতে কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে ও জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলেই গড়ে ওঠে পররাষ্ট্রনীতি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বিশ্বের সর্বত্র গমনাগমন যেমন সহজ হয়েছে পাশাপাশি ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের তাৎক্ষণিক যোগাযোগও সহজ হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'ন্যাটো' 'সেন্টো' 'সিয়াটো' প্রভৃতি আঞ্চলিক শক্তিজোট গড়ে উঠেছিল। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে 'ওয়ারশ চুক্তি' শক্তিজোটও গড়ে উঠেছিল। আবার ভারত, যুগস্লাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে 'জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন' নামে রাষ্ট্রজোট গড়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে জাতিসংঘ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ, সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট, বহুজাতিক সংস্থা প্রভৃতি অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে। হফ্‌মান, মোরস, কুপার প্রমুখের মতে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের তুলনায় অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ভূমিকা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। কোলম্যান-এর অভিমত হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় জাতি-রাষ্ট্রগুলি এখনো মুখ্য বিষয় হলেও ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। এফ. এস. জনের মতে, জাতীয় সীমানার বাইরে প্রকৃত সম্পর্কের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে ওঠা 'জ্ঞানের সমষ্টি'কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা যায়। হার্টম্যানের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে, জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। আবার কুইনসি রাইট বলেন যে, 'অনিশ্চিত সার্বভৌমিকতার অধিকারী সংগঠন'গুলিকে নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে। হফম্যানের মতে, পৃথিবী যেসব মূল এককে বিভক্ত, তাদের বহির্বিষয়ক নীতি ও ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম

উপাদানসমূহ ও কার্যাবলী নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করে। কে.জে.হলস্‌টির মতে, সাধারণভাবে নিয়মিত প্রক্রিয়া অনুসারে পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল স্বাধীন রাজনৈতিক শর্তাবলী নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনাকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি সাধারণ সংজ্ঞা বলা যায় ঃ- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল এমন একটি বিষয়, যা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতা, রাজনৈতিক আদর্শ, যুদ্ধ ও শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সংগঠন, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত, প্রচার, কূটনীতি, বিশ্ববাণিজ্য, সন্ত্রাসবাদ, বিশ্ব পরিবেশ প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ ঃ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন। যদিও অনেক বিখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ তাঁদের রচনায় পূর্বেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মূল্যবান মতামত দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্লেটো, অ্যারিস্টটল, থুকিডাইডিস, নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি প্রমুখ।

(1) ইউরোপে নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন ভূখণ্ডকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবকে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়িত করেছিল। এইসব রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

(2) ইউরোপ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানির জন্য বিদেশি বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও লিপ্ত হত। আধুনিক অস্ত্র-শক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্রগুলি দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে ভীতি প্রদর্শন করে নিজেদের শর্তে মীমাংসা করে নিতে বাধ্য করত। এই পদ্ধতিকে বলা হয় গোপন কূটনীতি।

যাই হোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোনো সুশৃঙ্খল আঙ্গ লোচনা ও বিশ্লেষণের পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব সময়কালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশ একটি সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

(3) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক পরিণতি জনমানসে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অসংখ্য জীবন ও সম্পত্তিহানি মানুষকে শান্তিকামী করে তোলে। যুদ্ধের অন্যতম কারণ গোপন কূটনীতিকে বর্জন করে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে জনগণের নিয়ন্ত্রণের দাবিতে জনমত সংগঠিত হয়।

(4) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে লেনিন ও উইলসনের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লেনিন তাঁর 'শান্তির জন্য অনুশাসন' নীতির প্রয়োগ করে গোপন কূটনীতির বিলোপ সাধন করেছিলেন এবং যাবতীয় বিরোধ মীমাংসা প্রকাশ্যে করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন ১৯১৮ সালে তাঁর 'চৌদ্দ দফাপ্রস্তাব' এর মাধ্যমে সর্বপ্রকার গোপন কূটনীতির অবসান ঘটিয়ে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা, সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি রূপায়ণে বিজয়ী পরাজিত সকল রাষ্ট্রকে সমমর্যাদা সাপেক্ষে ধারাবাহিক আলাপ আলোচনার কথা ঘোষণা করেন।

(5) সমকালীন সময় থেকেই (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিভাগ, সমমতাদর্শী গোষ্ঠী ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলস্ বিশ্ববিদ্যালয়, জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণা শুরু হয়।

(6) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পেশাগত সংগঠন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রিকা অস্ট্রেলিয়ান আউটলুক পাশাপাশি পেশাগত সংগঠন 'আইসা' ও 'বিসা-র' ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ কোয়াটারলি' 'ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ রিভিয়ু', ফরেন পলিসি অ্যানালিসিস প্রভৃতি সাময়িক পত্রের ভূমিকাও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল।

(7) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যথাক্রমে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওই দুটি সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ লন্ডন, মাদ্রিদ ও প্রাগে পঠনপাঠন সংক্রান্ত তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিল। ওই সম্মেলনগুলির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পৃথকশাস্ত্র হিসাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা।

১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শক্তিক্ষয় হওয়ার ফলে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের উপনিবেশগুলি পরপর স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞ স্বংস্থা ১৯৪৮ সালে সেপ্টেম্বরে প্যারিসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সম্মেলন আহ্বান করে। ওই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে স্বীকার করা হয়।

(8) ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ঠান্ডা লড়াই-এর অবসান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে একক মহাশক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এই সময় থেকেই একমেরু বিশ্বের সূচনা হয়।

(9) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শুরু হয়েছিল জাতি রাষ্ট্রের আলোচনাকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য সূচীর মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতার চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র ভূমিকা ব্যাপক ও চূড়ান্ত।

এইভাবে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় থেকে বিশ্বায়নের যুগ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নানা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ধারাবাহিক গতিশীল প্রবাহের অভিমুখ বিকশিত হয়ে চলেছে।

অথবা

বিশ্বায়নের সংজ্ঞা লেখো। বিশ্বায়নের বিভিন্ন রূপ পর্যালোচনা করো।

উ: বর্তমানে 'বিশ্বায়ন'কে কেন্দ্র করে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজও সংস্কৃতি গভীরভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এতদ্‌ৎসত্ত্বেও বিশ্বায়নের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। জোফেস স্টিগলিৎস্ এর মতে, বিশ্বায়ন হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়তর সংহতি-সাধন, যার ফলে পরিবহণ ও যোগাযোগের ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রব্যসামগ্রী, পরিসেবা, পুঁজি, জ্ঞান ও মানুষের বিশ্বব্যাপী অবাধ যাতায়াত উন্মুক্ত ও সহজলভ্য হয়ে গেছে।

ডেভিড হেল্ড বিশ্বায়নকে 'কার্যকলাপ, মিথস্ক্রিয়া ও ক্ষমতার আন্তর্মহাদেশীয় প্রবাহ ও নেটওয়ার্ক' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পিটার মারকাস-এর অভিমত হল, বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের এমন এক ধরনের রূপ যা মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটায়। অতএব বিশ্বায়নকে এমন একটি বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা যায়, যাতে জাতিরাষ্ট্রের ধারণার অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত ও অবাধ আদান প্রদান চালানো সম্ভব হয়।

বিভিন্নরূপ ঃ- শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময় থেকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে পুঁজির গমনাগমন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি কাঁচামাল ও উদ্বৃত্ত মূল্যের মুনাফা লাভের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজি রপ্তানি করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিংশ শতকের সত্তর দশকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়কে ''রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের যুগ'' বলা যায়। তখন উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই শ্রমিক ও পুঁজির সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। পরবর্তীতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে আর্থিক সংকট

দেখা দিলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটিয়ে অবাধ বাণিজ্যিক নীতি প্রচারিত ও প্রতিফলিত হয়। কারণ এর ফলে লগ্নি পুঁজির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যাপক মুনাফা অর্জন সম্ভব। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শোষণমূলক দিকটিকে 'বিশ্বায়ন' নামে প্রচার করা হয়।

বিশ্বায়নে নিম্নলিখিত রূপগুলি হল ঃ-

(1) **অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ঃ-** অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধারণা বিশ্বের সমস্ত দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ড পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচির ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিশ্বায়ন হল- (a) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মানুষের অভিগমন ও নির্গমন (b) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তৃতি (c) একদেশের পুঁজি অন্য দেশে বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিজপণ্য সহ পরিসেবামূলক পণ্য উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট দেশ সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিক্রয়ের জন্য বাজার তৈরি করা (d) আন্তর্দেশীয় লগ্নি পুঁজির আদান প্রদান (e) বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যিক স্বাধীনতা দান (f) প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য তথা ভোগ্যপণ্যের প্রচার ও প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি।

(2) **রাজনৈতিক বিশ্বায়ন ঃ-** বিশ্বায়ন জাতিরাষ্ট্রের ধারণার বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থপূরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকে এবং সর্বস্তরের শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে পুঁজির অবাধ মুনাফা তথা শোচনের ওপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রবক্তরা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলোপ করে। 'বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থা' ও চান না কারণ তাহলে শোষণ বঞ্চনার দায়ভার তাদের ওপরে বর্তাবে এই আশঙ্কায়। সুতরাং বিশ্বায়ন বাধাবিহীন জাতিরাষ্ট্রের সমর্থক। যেখানে পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তি ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সুরক্ষায় রাষ্ট্রশক্তি দমনপীড়ন নীতি প্রয়োগ করতে পিছুপা হবে না। তাই বিশ্বায়ন জাতি-রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও গুরুত্বকে হ্রাস করে স্বায়ত্তশাসনের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্টা। কারণ ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহৎ পুঁজির নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে।

(3) **সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ঃ-** সংস্কৃতির বিশ্বায়নের লক্ষ্য হল পৃথিবীব্যাপী একটি সমরূপ সংস্কৃতি গড়ে তোলা। বর্তমানে সহজলভ্য ইন্টারনেট গণমাধ্যমের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সর্বক্ষেত্রে অবাধ যাতায়াত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। জাতি রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির নানা দিক পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রীয় সনাতনী সাংস্কৃতিক ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় বিশ্বের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমি ভোগবাদী সংস্কৃতি ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে।

যৌনতা ও মাফিয়াতন্ত্রের সঙ্গে হিংস্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিকৃত সংস্কৃতিকে আধুনিক সংস্কৃতি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। শিশু, কিশোর ও যুবকরা এই সর্বনাশা বিকৃত সংস্কৃতির শিকার হচ্ছে। মানুষের প্রতিবাদী সুস্থ চেতনাকে এইভাবেই বিকৃত সংস্কৃতি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

(2) উদারনীতিবাদ কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

উ: এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী উদারনীতিবাদ হল এমন একটি ধারণা, যা সরকারের কার্যপদ্ধতি ও নীতি হিসাবে ব্যক্তি ও সমাজের গ্রহণীয় আদর্শ হিসাবে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে। উদারনীতিবাদ হল এমন একটি স্বাধীন জীবনের কণ্ঠস্বর; যা ব্যক্তির চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশ সর্বত্রই সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায়। সংকীর্ণ অর্থে উদারনীতিবাদ বলতে বোঝায়, যে ব্যবস্থা দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন এবং শাসকদের মনোনয়ন ও অপসারণ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

ব্যাপক অর্থে উদারনীতিবাদ হল এমন একটি মানসিক ধারণা যা তার পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষের সঙ্গে মানুষের বৌদ্ধিক, নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ককে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং তাদের মধ্যে একাত্মতা স্থাপণনের জন্য সচেষ্ট থাকে। তাই স্বাধীনতাকেই উদারনীতিবাদের মূল আলোচ্য বিষয় বলা যায়।

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ-

(1) **রাজনৈতিক সাম্য ঃ-** সংশোধনমূলক উদারনৈতিক রাজনীতিবিদদের মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হিসাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেই গণতন্ত্র সফল হবে। বর্তমানে জন বিস্ফোরণসহ রাষ্ট্রের আকৃতি ও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জনগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা অসম্ভব। ফলে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই রাষ্ট্রপরিচালনা সম্ভবপর। সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থনে গঠিত হলেও দায়িত্বপ্রাপ্তির পর সমগ্র রাষ্ট্র তথা জনগণের ওপর তার কর্তব্য বর্তায় এবং ব্যক্তি, দল, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর ঊর্দ্ধে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

(2) **রাজনৈতিক ও পৌর অধিকার ঃ-** জনমতকে সুষ্ঠু সবল ও জাগ্রত রাখার জন্য উক্ত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। এই অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে- স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, সভাসমিতির অধিকার, সরকারের সমালোচনা অধিকার, জীবনের অধিকার, ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ইত্যাদি।

(3) **একদলীয় ব্যবস্থার বিরোধিতা ঃ-** বার্কার প্রমুখদের মতে, বহুদলীয় ব্যবস্থায় জনগণের নানাবিধ আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ পায় এবং জনগণ অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতন থাকে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কারণ ও তার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা

করে। ফলে সরকারি দল সেইমত জনস্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এভাবেই সচল থাকে।

(4) **গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন ঃ**- সরকার গঠনের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের পরে জনগণ শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। উদারনীতিবাদ বৈপ্লবিক বা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভের সম্পূর্ণ বিরোধী।

(5) **সার্বিক ভোটাধিকার ঃ**- উদারনীতিবাদের সমর্থকদের মতে, গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য জনগণের শাসন, তাই জনগণের চূড়ান্ত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের ভোটদানের অধিকার ও প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক।

(6) **নিরপেক্ষ আদালত ঃ**- সংশোধনমূলক উদারনীতিবাদীদের অভিমত হল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরপেক্ষ আদালতের প্রয়োজন। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা, সংবিধান রক্ষা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিরপেক্ষ আদালতের ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

(7) **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ-** দেশের সামগ্রিক উন্নতি, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের দায়বদ্ধতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নাগরিকদের থাকা প্রয়োজন। কাজের স্বাভাবিক উৎসাহ বজায় রাখার জন্য সম্পত্তির অধিকার থাকা প্রয়োজন।

(8) **জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঃ**- উদারনীতিবাদের মূল কথা জনকল্যাণকর রাষ্ট্র তাই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি যথেষ্ট বিস্তারের কথা বলা হয়। সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য সহনশীল কর ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্যেব নিয়ন্ত্রণ, আবশ্যিক শিল্প-বাণিজ্যেব জাতীয়করণ, জনমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ উদারনীতির নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

(9) **ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের বিরোধিতা ঃ**- উদারনীতিবাদ স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণমূলক দমন পীড়নের বিরোধিতা করে ঠিকই কিন্তু নাতসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পাশাপাশি সাম্যবাদেরও বিরোধিতা করে। উদারনীতিবাদিরা পুঁজিবাদের সমর্থক কিন্তু ফ্যাসিদের একনেতা এক দলের স্লোগান, ব্যাক্তিতন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক যুদ্ধবাদ বৈদেশিক নীতি এবং জাতিবিদ্বেষের চরম বিরোধীতা করে।

সাম্যবাদীদের একদলীয় শাসন ও সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা, উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা, শ্রেণীহীন শোষণহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধীতা করে উদারনীতিবাদ।

পরিশেষে বলা যায় পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা এবং শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে শোষণ করার জন্য উদারনীতিবাদের সমর্থকেরা সময়ের প্রেক্ষিতে নানারকম তত্ত্ব খাড়া করেন। মূলত বুর্জোয়া সমাজের স্থিতাবস্থা সুরক্ষিত করাই হল উদারনীতিবাদের মূল লক্ষ্য।

(3) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা করো।

উ: ২০১৫ সালের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা করো।

উ: আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যেসব কার্য সম্পাদন করে থাকে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(1) **নীতি নির্ধারণ করা ঃ**- শাসনবিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নীতি প্রণয়ন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে থাকে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকেন ক্যাবিনেটের সদস্যরা। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যথা; ভারত, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের প্রধান শাসক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা সরকারি নীতি নির্ধারণ করে থাকেন।

(2) **অভ্যন্তরীণ শাসন সংক্রান্ত কাজ ঃ**- আইনবিভাগ প্রণীত আইনগুলি শাসন বিভাগ-এর দ্বারা কার্যকরী হয়। অপরাধীকে কোর্টে হাজির করানো, কোর্টের রায় অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তির শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির মাধ্যমে শাসন বিভাগ দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করে। সরকারি কর্মচারী নিয়োগ বদলি, পদোন্নতি এবং প্রয়োজনে পদচ্যুতি প্রভৃতি কার্যবলী ও শাসনবিভাগ করে থাকে। জরুরী প্রয়োজনে অধ্যাদেশ জারি করা প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(3) **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ ঃ**- বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে শাসন বিভাগের ভূমিকাই মুখ্য। স্বীয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রেরণ অন্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণ ও সম্পাদন ইত্যাদি ও শাসন বিভাগের কাজ। রাষ্ট্রসংঘে যথাযথ উপস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বক্তব্য বিশ্বের কাছে তুলে ধরা এবং কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বা ছিন্ন করার দায়িত্বসহ উপরিউক্ত যাবতীয় কার্যাবলী পররাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(4) **সামরিক কার্যাবলী ঃ**- শাসন বিভাগের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের নিয়োগ করেন এবং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে সেনাবাহিনী শৃঙ্খলা রক্ষা, যুদ্ধ পরিচালনা করা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করেন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে সামরিক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

(5) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ ঃ-** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে প্রয়োজনে আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই আইনসভা প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি সাপেক্ষে আইনে পরিণত হয়। বর্তমানে আইনসভার কার্যাবলী অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনের সমস্ত দিক যথাযথভাবে

পর্যবেক্ষণের ও নির্ধারণের দায়িত্ব শাসন বিভাগের হাতে অর্পিত হয়। শাসন বিভাগ প্রণীত এইসব আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' বলা হয়।

(6) **বিচার সংক্রান্ত কাজ ঃ-** বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই শাসন বিভাগীয় প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। গুরুতর প্রমাণিত অভিযোগ সাপেক্ষে বিচারপতিদের বরখাস্ত করার ক্ষমতাও শাসন বিভাগের রয়েছে। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা বা শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করা প্রভৃতি বিচার-সম্পর্কিত কাজও রাষ্ট্রপ্রধান করে থাকেন। এছাড়া শাসন বিভাগের কোনো কর্মচারীর অপরাধের বিচারও শাস্তিদানের দায়িত্ব ও শাসন বিভাগের। একে 'প্রশাসনিক ন্যায়বিচার' বলা হয়।

(7) **অর্থ সংক্রান্ত কাজ ঃ-** জনমুখী বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। মন্ত্রীসভা চালিত শাসন ব্যবস্থায় কর নির্ধারণ ও ধার্য করা, অর্থব্যয়, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, সরকারি অর্থের হিসাব পরীক্ষা করা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এইসব অর্থ বিষয়ক কার্যাবলী অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(8) **জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত কাজ ঃ-** কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সংবিধানে রাষ্ট্র প্রধানের হাতে জরুরী অবস্থা-সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে ৩৫২, ৩৫৬, ও ৩৬০ নং ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শাসনবিভাগের কাজের এক্তিয়ার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মন্ত্রীসভাচালিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব ক্রমেই আরও দৃঢ় হচ্ছে। রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থাতেও দলীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা থাকে।

(4) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিশ্লেষণ করো।

উ: সংবিধানের ৭৫(i) নং ধারা অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। তবে লোকসভায় কোনো দল বা মোর্চার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে রাষ্ট্রপতি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বলতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোনো একটি কক্ষের সদস্য হতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর স্বাভাবিক কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ-

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাগে আলোচনা করা যায় ঃ-

(1) **লোকসভার নেতা বা নেত্রী ঃ-** প্রধানমন্ত্রী হলেন লোকসভার নেতা বা নেত্রী। লোকসভার অধিবেশন কখন ডাকা হবে, কতদিন চলবে, আলোচ্য বিষযসূচী নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকারের প্রধান হিসাবে সংসদে তিনি সরকারি নীতিসমূহ ও গৃহীত কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দেন। আলোচনা চলাকালে কোনো মন্ত্রীকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সময় সাহায্য করে থাকেন। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সঠিক যোগসূত্র বজায় রেখে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সংসদে পাশ করানোর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীকে সমগ্র লোকসভার নেতা হিসাবেই দায়িত্ব পালন করতে হয়।

(2) **মন্ত্রীসভা গঠনে ভূমিকা ঃ-** প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন ও দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রীসভা গঠনে প্রধানমন্ত্রীকে যে সব বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখতে হয় সেগুলি হল - (a) নিজদল বা মোর্চার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মন্ত্রীসভায় গ্রহণ (b) ভারতের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করা (c) তপশিলি জাতি উপজাতি সম্পদায় থেকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব (d) বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে মন্ত্রীসভা গঠন করা ইত্যাদি।

(3) **মন্ত্রীসভার নেতা ঃ-** বর্তমানে মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রধানমন্ত্রীকে শুধুমাত্র সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে অভিহিত করা যায় না। ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর সর্বময় কর্তৃত্ব অবিসংবাদী। কারণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের নিয়োগ, দপ্তর বণ্টন ও পদচ্যুত করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন। মন্ত্রীসভার বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং নীতি রূপায়নের চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে থাকেন। মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তিনি সমন্বয়সাধন করেন। ক্যাবিনেট কমিটিগুলির সভাপতি হিসাবে সমস্ত দপ্তরের সমস্ত বিভাগীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি অবগত থাকেন ও প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ও সর্বময় কতৃত্বের অধিকারী।

(4) **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা ঃ-** দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদাধিকারীদের নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি করে থাকেন। যেমন ঃ ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিয়ামক ও পরীক্ষক, নির্বাচন কমিশনারগন, অঙ্গরাজ্যের রাজপালগণ, সুপ্রিমকোর্টের ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের, সেনাবাহিনার প্রধানদেরসহ কেন্দ্রীয় অর্থকমিশন, জনপালন কৃত্যক কমিশনের পদাধিকারীদের নিয়োগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই চূড়ান্ত ও কার্যকর হয়।

(5) **রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা ঃ-** মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্তসহ শাসন ও আইন বিভাগীয় প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাত করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বও প্রধানমন্ত্রীর । সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

(6) **সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা ঃ**- লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হয়। দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁকেই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিতে হয়। পরবর্তী নির্বাচনে দল বা মোর্চার নির্বাচনী সাফল্য তাঁর জনপ্রিয়তার ওপরই নির্ভর করে। সমগ্র দেশের জনমত তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

(7) **জাতির নেতা ঃ-** প্রধানমন্ত্রী সমগ্র জাতির নেতা বা নেত্রী। তাই তাঁকে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীকে যেমন মোকাবিলা করতে হয় পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর কূটনৈতিক ভূয়োদর্শিতা ও দৃঢ়তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষিপ্রতা জাতিকে বিশ্বের দরবারে উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করে। যে কোন দুর্যোগ ও সমস্যায় তিনিই জাতিকে আশ্বস্ত করেন। তাঁর বক্তব্যই রাষ্ট্রের বক্তব্য, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গেই জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। তাই প্রধানমন্ত্রী সর্বোতাভাবে জাতির নেতা ও মুখপাত্র।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তত্ত্বগতভাবে তিনি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য তার অন্যতম কারণ হল মন্ত্রীরা তাঁর সহকর্মী অধস্তন কর্মচারী নন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা স্বীয় স্বীয় দপ্তর পরিচালনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ও জনসভায় সরকারের নীতিসমূহ ঘোষণা করেন ইত্যাদি। দল বা মোর্চার নেতৃত্ব তিনি দিয়ে থাকেন এবং নির্বাচনে দল বা মোর্চা ও সরকারের পক্ষে তিনি নেতা হিসাবে প্রতিভাত হন।

কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। দল ও সংসদে তাঁর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য থাকলে তিনি প্রায় একনায়কের পর্যায়ে উন্নীত হন। মন্ত্রীসভার গঠনে দপ্তর বন্টনে ও পদচ্যুতির ব্যাপারে তিনিই শেষ কথা বলার অধিকারী। এছাড়া সংবিধান অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

পরিশেষে বলা যায় ভারতবর্ষের ন্যায় বৈচিত্রপূর্ণ দেশে প্রধানমন্ত্রীকে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। তাঁকে জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে গতিশীল রাখতে হয়। বিরোধী দলের সমালোচনার কোনো বিষয় যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। দেশের ধর্ম বর্ণ জাতপাত ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্ব বজায় রেখে সকলকে সুযোগ দিতে হয়। দল বা মোর্চার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে নেতৃত্ব বজায় রাখতে হয়। এভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে নীতি নির্ধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয়। তবে সংসদে যদি দলের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা পায়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, রুচিবোধ, পাণ্ডিত্য, লোকশ্চরিত্র জ্ঞান, সততা ও সহৃদয়তার ওপর তাঁর মর্যাদা ও নেতৃত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল।

(5) ভারতের সংসদের রাজ্যসভা ও লোকসভার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

উ: রাষ্ট্রপতি , লোকসভা এবং রাজ্যসভা নিয়ে ভারতের সংসদ গঠিত। লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ ঃ-

গঠনগত দিক ঃ- রাজ্যসভার মর্যাদা উচ্চকক্ষ হিসাবে পরিচিত হলেও সদস্য সংখ্যার নিরিখে নিম্নকক্ষ লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। রাজ্যসভার আসন সংখ্যা অনধিক ২৫০ আর লোকসভার সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক ৫৫২ জন।

ভারতের অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মানুযায়ী গোপন ভোটের দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। অন্যদিকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এর মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে লোকসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সাহিত্য, বিজ্ঞান সমাজসেবা প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২জনকে রাজ্যসভায় মনোনীত করতে পারেন। আর লোকসভায় ইঙ্গ ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে ২জনকে মনোনীত করে থাকেন।

রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে প্রার্থীকে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হয়। আর লোকসভার ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হয়। রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। লোকসভার সদস্যদের স্বাভাবিক কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর। রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ এবং প্রতি ২বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। লোকসভা তার সম্পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করলে ৫বছর অন্তর পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে লোকসভা ভেঙে গেলে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনে লোকসভার মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা যায়।

ক্ষমতাগত পার্থক্য ঃ-

(1) **উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা ঃ-** যেসব বিষয়ে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতার অধিকারী সেগুলি হল- (a) অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য সব বিল সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং উভয় কক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে আইনে পরিণত হয়। (b) উভয় কক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধন করা যায়। (c) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও পদচ্যুতির ব্যাপারে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমান। এছাড়া সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য উচ্চপদাধিকারীদের উভয় কক্ষের সম্মতিতে পদচ্যুত করা যায়। (d) আইনসভা অবমাননাকারী যে কেউকে উভয় কক্ষই শাস্তি দিতে পারে। (e) নতুন হাইকোর্ট স্থাপন বা কোন আদালতকে হাইকোর্টে উন্নীত করার অধিকার উভয় কক্ষের। (f) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা উভয় কক্ষেই অনুমোদিত হতে হয়।

(2) **রাজ্যসভার প্রাধান্য ঃ-** যে সব বিষয়ে রাজ্যসভার একক প্রাধান্য রয়েছে সেগুলি হল— (a) রাজসভার উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবক্রমে জাতীয়স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রনয়ণ করা যায়। (b) এই একই পদ্ধতিতে

রাজ্যসভা নতুন কোনো সর্ব-ভারতীয় কৃত্যক গঠন করতে পারে। (c) রাজ্যসভা এককভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার প্রস্তাব আনতে পারে।

(3) **লোকসভার প্রাধান্য ঃ-** লোকসভার যে সব বিষয়ে প্রাধান্য রয়েছে সেগুলি হল - (a) অর্থবিল শুধুমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায় এবং কোন বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়ে লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এছাড়া ব্যয় মঞ্জুরি দাবি, বিনিয়োগ বিল পাস প্রভৃতি বিষয়ে লোকসভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাজ্যসভা অর্থবিলের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা। (b) অর্থবিল রাজ্যসভায় পাঠানোর ১৪ দিনের মধ্যে ফেরৎ পাঠাতে হয়—ফেরৎ না পাঠালে বিলটি উভয়কক্ষে গৃহীত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হয়। (c) অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। লোকসভার স্পীকারের সভাপতিত্বে যৌথ সভায় বিলটি পাস হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি থাকায় লোকসভার মতামতই গ্রাহ্য হয়। (d) প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভা লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকায় লোকসভার আস্থা হারালে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। রাজসভার এইরূপ ক্ষমতা নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে লোকসভা ও রাজ্যসভা সম-ক্ষমতার অধিকারী নয়। সংখ্যাধিক্য ও মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্বশীলতার জন্য লোকসভার ক্ষমতা ও গুরুত্ব অনেক বেশি।

অথবা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষের ভূমিকার পর্যালোচনা করো।

উ: কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষ লোকসভার স্পীকারের ন্যায় রাজ্য বিধানসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ বিধানসভা পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বিধানসভার মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব অধ্যক্ষের উপরে ন্যস্ত।

নির্বাচনের পর রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে সভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে অধ্যক্ষ হিসাবে ও একজনকে উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পীকার হিসাবে নির্বাচিত করেন। বিধানসভা পরিচালনা ও কোন বিলের পক্ষে ভোটাভুটির সময় তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। তবে কোন বিলের পক্ষে-বিপক্ষে সম সংখ্যক ভোট পড়লে অধ্যক্ষ একটি 'নির্ণায়ক ভোট' দিয়ে বিষয়টির ফয়সালা করেন। বিধানসভার স্বাভাবিক মেয়াদের মতো স্পীকারের কার্যকালের মেয়াদও পাঁচ বছর। তবে তিনি পদত্যাগ করলে, মৃত্যু হলে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ কর্তৃক পদচ্যুত হলে স্পীকারের পদ শূন্য হয়।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ- পশ্চিমবঙ্গও ভারতের একটি অন্যতম অঙ্গরাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৯৪ জন। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ তথা রাজ্যবিধানসভাগুলির অধ্যক্ষের ক্ষমতার উৎস হল ভারতের সংবিধানে রাজতালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিধানসভার কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত বিধি। এছাড়া তাৎক্ষণিক কিছু অলিখিত ক্ষমতাও তাঁর আছে। অধ্যক্ষের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাগুলি হল—

(1) **সভাপরিচালনা ঃ-** সুশৃঙ্খলভাবে সভাপরিচালনা করা অধ্যক্ষের দায়িত্ব। বিধানসভায় কোন বিষয়গুলি উত্থাপন করা হবে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, কোন নোটিশ আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ। পরিস্থিতি সাপেক্ষে বিধানসভার কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন ব্যাখ্যা করেন অধ্যক্ষ। সভার আলোচনা শুরু করার অনুমতি অধ্যক্ষ যেমন প্রদান করেন পাশাপশি আলোচনা বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অধ্যক্ষ তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনা করবেন কিনা তা একান্তই তাঁর ইচ্ছাধীন। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে।

(2) **শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ঃ-** সভার দৃষ্টি আকর্ষণসহ সভায় ভাষণ দিতে হলে সব সদস্যকেই সভার অনুমতি নিতে হয়। সদস্যদের বক্তব্য রাখার ক্রমতালিকা অধ্যক্ষই স্থির করেন। সদস্যরা যাতে সুশৃঙ্খল আচরণ করেন এবং সংসদীয় ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন অধ্যক্ষ সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। বিধানসভার ভিতরে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত তাই তাঁর নির্দেশ সবাই মেনে চলেন। সভায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যদিগকে কক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন, মৃদু ভৎর্সনা করতে পারেন প্রয়োজনে মার্শাল দিয়ে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সভার বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে গেলে অধ্যক্ষ সভার কার্য সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন।

(3) **সদস্যদের অধিকার রক্ষা ঃ-** বিধানসভার সদস্য বা সদস্য নন যে কেউ অধিকার ভঙ্গ করলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সভার সদস্যদের বিশেষ অধিকারসমূহ রক্ষার দায়িত্ব অধ্যক্ষের।

(4) **অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ**- কোনো বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়ে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অর্থবিলকে চিহ্নিত করার জন্য তিনি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

(5) **যোগাযোগের মাধ্যম ঃ-** রাজ্যপাল ও বিধানসভার মধ্যে যোগযোগের মাধ্যম হলেন অধ্যক্ষ। রাজ্যপাল প্রেরিত বানী, বার্তা ইত্যাদি বিধানসভায় পেশ করেন অধ্যক্ষ। তৎসহ বিধানসভার কার্যাবলী রাজ্যপালকে তিনি জ্ঞাত করেন।

(6) **'কোরাম' পর্যবেক্ষন ঃ**- বিধানসভায় 'কোরাম' বা নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য অনুপস্থিত থাকলে তিনি সভার কাজ বন্ধ রাখতে পারেন। সভার মোট সদস্যের এক-দশমাংশের উপস্থিতিতে 'কোরাম' হয়।

(7) **কমিটি সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** বিধানসভার বিভিন্ন কমিটি গঠনের দায়িত্ব স্পীকারের। কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের তিনিই নিয়োগ করেন। কমিটিগুলি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনেই কাজ করে।

(8) **পদত্যাগপত্রের সত্যতা বিচার সহ সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা ঃ-** বিধানসভার কোন সদস্য তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করলে সেই পদত্যাগপত্র স্বইচ্ছায় করা কিনা তা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। অনুসন্ধানের পরে তিনি নিশ্চিত হলেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। এছাড়া বিধানসভার কোন সদস্য দলত্যাগ-বিরোধী আইন অনুযায়ী সদস্যপদ রাখার যোগ্যতা হারালে তিনি সেই সদস্যের সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করতে পারেন।

(9) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ**- অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- (a) কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্যদের জ্ঞাত করার জন্য অধ্যক্ষ সভায় আলোচনা করেন। (b) অধিবেশনের কার্যক্রম দেখার জন্য তিনি সাংবাদিক ও দর্শকদের গ্যালারিতে বসার অনুমতি প্রদান করেন। (c) সভার কার্যবিবরণী তাঁর তত্ত্বাবধানেই সংরক্ষিত হয়। (d) এছাড়া দলত্যাগ বিরোধী আইনে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা অধ্যক্ষের আছে। পদত্যাগে ইচ্ছুক সদস্যকে অধ্যক্ষের কাছেই পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হয় এবং তিনি তার সত্যতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

পরিশেষে বলা যায় রাজ্যবিধানসভার অধ্যক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের একজন নিরপেক্ষ সঞ্চালক। বিধানসভার অভ্যন্তরে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সরকারি ও বিরোধীপক্ষ উভয়পক্ষের সদস্যদের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ও সমান সুযোগ দেওয়া অধ্যক্ষের মর্যাদার অনুপন্থী।

Part- B

1. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো ঃ 1 × 24 = 24

(i) ঠান্ডা লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত দেশগুলির নাম

(a) ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (b) চীন ও পাকিস্তান

(c) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (d) জার্মানি ও ভারত

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন

(ii) ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান হয়

(a) 1980 সালে (b) 1995 সালে

(c) 1991 সালে (d) 2000 সালে

উ: 1991 সালে

(iii) বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল

(a) 1945 সালে (b) 1950 সালে

(c) 1955 সালে (d) 1960 সালে

উ: 1955 সালে

(iv) সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়

(a) 1985 সালে (b) 1945 সালে

(c) 1990 সালে (d) 2015 সালে

উ: 1985 সালে

(v) ভারতের পররাষ্ট্র নীতির একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল

(a) ব্যাবসার প্রসার (b) অন্য রাষ্ট্রকে অধীনে আনা

(c) পঞ্চশীল নীতির অনুসরণ (d) এদের কোনোটিই নয়

উ: পঞ্চশীল নীতির অনুসরণ

(vi) "The Making of Foreign Policy" গ্রন্থটির লেখক হলেন

(a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (b) মরগেনথাউ

(c) জোসেফ ফ্রাঙ্কেল (d) ইভান লুয়ার্ড

উ: জোসেফ ফ্রাঙ্কেল

(vii) 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব সাধারণ সভায় গৃহীত হয়

(a) 1960 সালে (b) 1970 সালে

(c) 1950 সালে (d) 1965 সালে

উ: 1950 সালে

(viii)নিরাপত্তা পরিষদে ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে

(a) মহাসচিব (b) সমস্ত সদস্যরা

(c) স্থায়ী সদস্যরা (d) অস্থায়ী সদস্যরা

উ: স্থায়ী সদস্যরা

(ix) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পূর্ববর্তী সংস্থাটি হল

(a) অছি পরিষদ (b) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

(c) নিরাপত্তা পরিষদ (d) জাতিসংঘ

উ: জাতিসংঘ

(x) 1945 সালে ———— টি সদস্য নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তার যাত্রা শুরু করেছিল।

(a) 21 (b) 50

(c) 187 (d) 193

উ: 50

(xi) সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন

(a) উপরাষ্ট্রপতি (b) স্পিকার

(c) রাজ্যপাল (d) রাষ্ট্রপতি

উ: স্পিকার

(xii) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরা নিযুক্ত হন ———— -এর দ্বারা।

(a) রাষ্ট্রপতি (b) প্রধানমন্ত্রী

(b) স্পিকার (d) মুখ্যমন্ত্রী

উ: রাষ্ট্রপতি

(xiii)অর্থবিল প্রথম উপস্থাপিত হয়

(a) লোকসভায় (b) রাজ্যসভায়

(c) সুপ্রিম কোর্টে (d) হাইকোর্টে

উ: লোকসভায়

(xiv) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত মোট সদস্য হল

(a) 294 (b) 180

(c) 160 (d) 295

উ: 294

(xv) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স হল

(a) 65 বছর (b) 62 বছর

(c) 60 বছর (d) 70 বছর

উ: 65 বছর

(xvi) ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরি হয়

(a) 1985 সালে (b) 1986 সালে

(c) 1987 সালে (d) 1988 সালে

উ: 1986 সালে

(xvii) লোক আদালত প্রথম গঠিত হয়েছিল

(a) দিল্লিতে (b) জুনাগড়ে (গুজরাট)

(c) চেন্নাইতে (d) মুম্বাইতে

উ: জুনাগড়ে (গুজরাট)

(xviii) কলকাতা হাইকোর্টের এলাকা রয়েছে ———— পর্যন্ত।

(a) ওড়িশা (b) বিহার

(c) ত্রিপুরা (d) আন্দামান ও নিকোবার

উ: আন্দামান ও নিকোবার

(xix) পশ্চিমবঙ্গে ন্যায় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয় ———— সালে।

(a) 1966 সালে (b) 1977 সালে

(c) 1995 সালে (d) এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি

উ: এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি

(xx) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হতে হলে ন্যূনতম বয়স হতে হয়

(a) 30 বছর (b) 35 বছর

(c) 45 বছর (d) বয়সের কোনো শর্ত নেই

উ: বয়সের কোনো শর্ত নেই

(xxi) কর্পোরেশনের আমলাতান্ত্রিক প্রধান হলেন

(a) মেয়র (b) ডেপুটি মেয়র

(c) কমিশনার (d) কাউন্সিলার

উ: কমিশনার

(xxii) তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য 73 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে

(a) 1992 সালে (b) 1993 সালে

(c) 1994 সালে (d) 1995 সালে

উ: 1992 সালে

(xxiii) ———— হলেন ব্লকের বিকাশমূলক কার্যের উদ্যোক্তা।

(a) B.D.O. (b) S.D.O.

(c) D.M. (d) P.M.

উ: B.D.O.

(xxiv) কলকাতা পৌরনিগম আইন প্রণীত হয়েছিল

(a) 1980 সালে (b) 1982 সালে

(c) 1992 সালে d) 1993 সালে

উ: 1980 সালে

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ঃ 1 × 16 = 16

(i) NAM-এর পুরো কথাটি কী ?

উ: Non-Aligned Movement.

অথবা

NATO-এর পুরো কথাটি কী ?

উ: North Atlantic Treaty Organization.

(ii) পটস্‌ডাম সম্মেলনে যোগদানকারী যে-কোনো দুজন নেতার নাম লেখো।

উ: জোসেফ স্ট্যালিন ও হেনরি এস. ট্রুম্যান।

অথবা

বহুমেরুতা বলতে কী বোঝো?

উ: যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বা দুটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ছোটো বড়ো অনেক রাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রজোট গড়ে ওঠে এবং বিশ্বের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার-এর প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় তাকেই বহুমেরুতা বলে।

(iii) মার্শাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

উ: মার্শাল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করা ও তৎসহ কম্যুনিজম বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন করা।

অথবা

দ্যঁতাৎ বলতে কী বোঝো?

উ: দ্যঁতাৎ বলতে বোঝায় দুটি রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টা তথা উত্তেজনার প্রশমন অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিবর্তে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি।

(iv) SAPTA-র পুরো কথাটি কী?

উ: South Asian Free Trade Area.

অথবা

NPT-র পুরো কথাটি কী?

উ: Non Proliferation Treaty.

(v) গুজরাল নীতি কার সৃষ্টি?

উ: ইন্দর কুমার গুজরাল ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র—ও প্রধানমন্ত্রী।

অথবা

ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কার সাথে শান্তি স্থাপনের জন্য চুক্তি করেন 1987 সালে?

উ: রাজীব গান্ধী।

(vi) পররাষ্ট্রনীতির দূরপাল্লার লক্ষ্য কাকে বলে?

উ: কে. জে. হলস্টির মতে পররাষ্ট্রনীতির দূরপাল্লার লক্ষ্য বলতে বোঝায় চূড়ান্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন।

(vii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন দুটি সংস্থা সনদ সংশোধনের কাজ করে?

উ: নিরাপত্তাপরিষদ ও সাধারণসভা।

অথবা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী?

উ: আন্তোনিও গুটেরেস।

(viii)সাধারণ সভায় প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র কতজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে?

উ: সাধারণ সভায় প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র 5 জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে।

(ix) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়?

উ: 54 জন।

(x) আন্তর্জাতিক আদালত কোথায় অবস্থিত?

উ: নেদারল্যান্ডের 'হেগ' শহরে।

অথবা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দিবস রূপে বছরের কোন দিনটি পালিত হয়?

উ: 24 অক্টোবর।

(xi) ভারতের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন?

উ: একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের ভিত্তিতে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-এর নিয়মানুযায়ী গোপন ভোটের মাধ্যমে একটি নির্বাচক সংস্থা দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ভারতের সংসদের উভয় কক্ষের ও ভারতের সব অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে নির্বাচক সংস্থা গঠিত হয়।

(xii) রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' বলতে কী বোঝো?

উ: যে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য নন। যেসব বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(xiii)সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার বা এলাকাগুলি কী কী?

উ: a) মূল এলাকা, b) আপিল এলাকা, c) পরামর্শ দান এলাকা, d) নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা।

অথবা

গণ-আদালতের কার্যাবলি কী?

উ: (a) ভারতের বিভিন্ন আদালতের কাজের চাপ হ্রাস করা। (b) দ্রুত বিরোধের নিষ্পত্তি করা। (c) নাগরিকদের বিনা ব্যয়ে বিচার পাওয়ার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি।

(xiv)বিচার বিভাগীয় অতি সক্রিয়তা বলতে কী বোঝো?

উ: আদালত ক্ষেত্র বিশেষ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের ওপর যে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে তাকেই বিচার বিভাগীয় অতি সক্রিয়তা বলে।

(xv) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরের নাম কী?

উ: জেলা পরিষদ।

(xvi)বরো কমিটি কী?

উ: 2015 সালের 2-SAQ -এর xvi নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

Political Science
2018
PART - A (30 Marks)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ-

(1) ক্ষমতা কাকে বলে ? ক্ষমতার উপাদানগুলি আলোচনা করো।

উ: ২০১৬ সালের (i) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা

বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থের ভূমিকা কী? জাতীয় স্বার্থরক্ষার বিভিন্ন উপায়গুলি উল্লেখ করো।

উ: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থের ভূমিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(a) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল জাতীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। কারণ দেশের স্বাধীনতা বজায় না থাকলে দেশটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে না। স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সরকারকে সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে হয়। যেহেতু সব রাষ্ট্রের সমান আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা থাকে না তাই রাষ্ট্রীয় সুস্থিতি রক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিশালী সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলির সাহায্য নিতে হয়।

(b) প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন জাতীয় উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। জাতীয় উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নকেও বোঝায়। উদ্বৃত্ত কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানির মাধ্যমে দেশের উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও সঠিক কূটনীতি অনুসরণের মাধ্যমে একটি দেশ শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

(c) প্রতিটি রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি বৈদেশিক নীতির যার প্রভাব পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রভৃতির পরিবর্তে একটি সহবস্থান ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা। কিন্তু শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি তাদের পুঁজি ও অর্থনীতি প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে অস্ত্র বিক্রীসহ রাষ্ট্রগুলিকে তাদের পণ্য বিক্রীর বাজারে পরিণত করে। তাই অধিকাংশ উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে জাতীয় স্বার্থে তাদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ সহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়।

(d) যদিও রাজনৈতিক মতাদর্শকে জাতীয় স্বার্থের উপাদান হিসাবে গণ্য করা নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী ধারণায় বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,

নীতি, কর্মসূচি প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপক মত পার্থক্য দেখা যায়। এর ফলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৈদেশিক নীতি ও ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

(e) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের শক্তির প্রমাণ দিতে পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করে এবং তার ভয়াবহতা সমগ্র বিশ্বকে আতঙ্কিত করে। কিন্তু তারপরেই পৃথিবীর অসংখ্য দেশ একে একে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে পড়ে। তাই শক্তিধর রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থেই নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারবোধ, মারণাস্ত্রের সংকোচনসহ যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমনে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহ বস্থানের কথা বলেছে। কিন্তু কূটনৈতিক ধূর্ততা হিসাবে ওইসব বক্তব্য এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য যতক্ষণ না আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ততদিন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ শক্তির প্রভাবে জাতীয় স্বার্থে ওইসব রাষ্ট্রগুলির নির্দেশে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করবে।

ক্ষমতার উপাদানসমূহ ঃ-

উ: ২০১৬ সালের (i) অথবা প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(2) মার্কস-এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো।

উ: মার্কসবাদীরা সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, হঠাৎই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে। এঙ্গেলস্-এর মতে, অনাদি অনন্তকাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। একসময় এমন সব সমাজ ছিল, যেগুলি রাষ্ট্র ছাড়াই চলত আর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিবর্তনের একটি বিশেষ পর্যায়ে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণীবিভাগ এল, তখনই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

রাষ্ট্র শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার ঃ- সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে মার্কস ও এঙ্গেলস্ এর মতে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

(i) **আদিম সমভোগবাদী সমাজ ঃ-** এইরূপ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনোপ্রকার অস্তিত্ব না থাকার ফলে শ্রেণী শোষণ ছিল না। ফলে শোষণ ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য সেই সময় কোনো রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল, পণ্য বিনিময় ও শ্রমবিভাগের প্রচলন হল তখন সমাজ জীবনে এবং অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। এঙ্গেলস্-এর মতে ''সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একত্রে ধরে রাখে এবং প্রত্যেকটি পর্বেই রাষ্ট্রের অবস্থান শাসকশ্রেণি পক্ষে এবং সবক্ষেত্রেই তা হল মুখ্যত শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণিতে দমন

করার যন্ত্র মাত্র"। রাষ্ট্র হল সাধারনত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত্বকারী শ্রেনির রাষ্ট্র। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধান শোষক শ্রেনিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাতেও সহযোগিতা করে। এইভাবে নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণিকে শোষণ ও পীড়ন-এর হাতিয়ার ও রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেনির পক্ষে কাজ করে। দাসযুগে দাস মালিকেরা শোষণ অত্যাচার চালাতো রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে। আঙ্ক বার সামন্তযুগে অভিজাতরা ভূমিদাসদের শোষণ করত। আর আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজির লগ্নি বিনিয়োগ ইত্যাদি নানা কৌশলে শ্রমজীবী মানুষের শ্রমও মজুরি শোষণের হাতিয়ার মাত্র।

(ii) **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি ঃ-** বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সর্বহারা শ্রেনি মুক্তির জন্য বিপ্লবের পন্থা অনুসরন করে রাষ্ট্রকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে সর্বহারাদের শাসক পদে অধিষ্ঠিত করে। এই চুড়ান্ত ও চরম সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেনীর জয় হয় এবং বুর্জোয়া শক্তির পতন হয়ে 'সর্বহারা শ্রেনির একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠা হয়। এরূপ রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। এইরূপ রাষ্ট্রে উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সবাই তার শ্রমের আনুপাতিক হারে মজুরি পায়। এইরূপ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল- (a) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক ও কৃষক সমাজতন্ত্রের স্বার্থে সশস্ত্র শক্তির কেন্দ্র কিন্তু জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। (b) রাষ্ট্রের ক্ষমতাধারী প্রতিনিধি বর্গ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবে এবং গণ ইচ্ছায় বরখাস্তও হতে পারবে। (c) সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকার ফলে আমলাতন্ত্র ছাড়াই রাষ্ট্রের সর্ববিধ সংস্কার সাধন সম্ভব। (d) এছাড়া শ্রেনী সচেতন প্রগতিশীল নেতৃত্বে রাষ্ট্ররূপ সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল থাকবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি, দেশের সম্পদ জনগণের হাতে প্রদান, জনসাধারণকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার দান, নারীর সম্ভ্রম ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা, জাতিবিভাজন দূর করাসহ প্রধান লক্ষ্য হল শ্রেনি শোষণের অবসান এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন।

(iii) **রাষ্ট্রের অবসান ঃ-** সমাজতান্ত্রিক সমাজ যখন 'সাম্যবাদী সমাজে' পরিবর্তিত হবে তখন উৎপাদনের ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে কোনোরূপ শ্রম বিভাজন থাকবে না। সমাজে প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সব পাবে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের 'বিলুপ্তি ঘটবে'।

(iv) **গুরুত্ব ঃ-** মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যেমন- রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মার্কস শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া সমাজ বিবর্তনের স্তরে ধর্ম, আদর্শ, সংস্কৃতি, ন্যায়নীতি প্রভৃতি উপাদানের অপরিহার্য ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না।

কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির মধ্যে শুধুমাত্র মার্কসবাদই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মার্কসবাদীরা দাবি করে থাকেন। তাঁদের মতে, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদীরা সমাজ পরিবর্তনের জন্য যে পথ দেখিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

(3) ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

উ: ২০১৫ সালের (iv) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা,

ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যাখ্যা করো।

উ: সংবিধানের [164 (i)] নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। বিধানসভার নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রীকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। তবে কোনো দল বা মোর্চা যদি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পায় তাহলে রাজ্যপাল তাঁর বিবেচনা মতো কাউকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে পারেন ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বলতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীকে আইনসভার সদস্য হতে হয় (দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট রাজ্য আইনসভা হলে, যে কোনো কক্ষের) এবং তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ঃ-

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাগে আলোচনা করা যায় ঃ-

(1) **রাজ্য বিধানসভার নেতা ও নেত্রী ঃ-** রাজ্য বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত রাখা এবং প্রয়োজনে ভেঙে দেওয়ার জন্যও রাজপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। রাজ্য সরকারের প্রধান হিসাবে সভায় সরকারি নীতি,কার্যক্রম ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। বিধানসভায় কোনো প্রস্তাবের উপর বিতর্ক ও আলোচনা চলাকালীন কোনো মন্ত্রী অসুবিধায় পড়লে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের উন্নয়নে গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তাঁকেই করতে হয়। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ ও আইনসভার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। বিধানসভায় মন্ত্রীসভার গরিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেও পারেন বা নাও করতে পারেন।

(2) **মন্ত্রীসভার নেতা বা নেত্রী ঃ-** যদিও মুখ্যমন্ত্রীকে 'সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' বলা হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রধান হিসাবে প্রভূত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই রাজ্যপাল মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ

করেন ও দপ্তর বণ্টন করেন। কোনো মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ও মন্ত্রীসভার ঐক্য বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁর। মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনি এবং মন্ত্রীদের একক ও যৌথ যে কোনো সিদ্ধান্ত তাঁর চূড়ান্ত সম্মতি সাপেক্ষে গৃহীত হয়। তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনেই মন্ত্রীসভা পরিচালিত হয়।

(3) **সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী ঃ**- বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতা বা নেত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের দল বা মোর্চার ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হয় এবং দল বা মোর্চার কার্যকলাপ তথা বিতর্ক ও আলোচনা যাতে জনমুখী হয় সে দিকেও লক্ষ রাখতে হয়। সরকার ও সরকারি দল বা মোর্চার সাফল্য মুখ্যমন্ত্রীর কর্মদক্ষতা ও সক্রিয়তার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। দলীয় শৃঙ্খলাও বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁর।

(4) **রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা ঃ**- সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যপাল ও মন্ত্রীসভার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হলেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জ্ঞাত করার দায়িত্ব তাঁর। শাসনসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে রাজ্যপাল জানতে চাইলে তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করার দায়িত্বও মুখ্যমন্ত্রীর।

(5) **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল, রাজ্য জনকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদিগকে নিয়োগের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্যপালকে দিয়ে থাকেন। এছাড়া রাজ্যের প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন কমিটি, কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য প্রভৃতি নিয়োগের সুপারিশ মুখ্যমন্ত্রীই করেন। সকল নিয়োগেই মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ মতো করতে রাজ্যপাল বাধ্য থাকেন।

(6) **অন্যান্য কার্য ঃ-** মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বদা জনমতের দিকে লক্ষ রেখে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরকারের কার্যকরী সদিচ্ছার নিদর্শন রাখেন। তিনি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে রাজ্যের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে তার প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে জনমতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। অতএব রাজ্যের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

পদমর্যাদা ঃ- কেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যে ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই রাজশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিই রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতার উৎস। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তবে রাজ্যপালের কিছু 'স্বেচ্ছাধীন' ক্ষমতা থাকার দরুণ কিছু ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় রাজপাল নেহাতই নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতোই

তাঁকে রাজ্যশাসন করতে হয়। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে রাজ্য বিধানসভায় সরকারি দলের গরিষ্ঠতা, দল বা মোর্চার উপর তাঁর কর্তৃত্ব, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার প্রভৃতি পরিস্থিতি ও বিষয়ের ওপর। তবে মুখ্যমন্ত্রীর পান্ডিত্য, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, লোকশ্চরিত্রজ্ঞান, গণসম্মোহনি ভাবমূর্তি, চরিত্রগত দৃঢ়তা, সমদৃষ্টি ইত্যাদি তাঁর পদমর্যাদাকে বৃদ্ধি করে।

(4) ভারতীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

উ: রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত। উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৪৫ জন। লোকসভা অনধিক ৫৫২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪৫ জন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে সভার কাজ পরিচালনা করেন। আর লোকসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত লোকসভার অধ্যক্ষ সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজসভা স্থায়ী কক্ষ এবং সদস্যদের কার্যকাল ৬ বছর। অন্যদিকে লোকসভার স্বাভাবিক মেয়াদ ৫ বছর।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ-

ভারতীয় পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও কার্যাবলী হল—

(1) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- সংবিধানে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনটি তালিকা বিদ্যমান। যথা কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত ১০০টি বিষয়ে পার্লামেন্ট এককভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে। আর যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৫২টি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে রাজ্য আইন ও কেন্দ্রীয় আঞ্জ ইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রনীত আইনই গ্রাহ্য হবে। তাছাড়া অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারও পার্লামেন্টের রয়েছে। দেশে জরুরি অবস্থা জারি থাকলে বা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হলে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির শর্তাদি সাপেক্ষে, দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধক্রমে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(2) মন্ত্রীসভা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঃ- প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষের সদস্যদিগের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে মন্ত্রীসভার সদস্যদের অবশ্যই পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়। পার্লামেন্টের সদস্য নয় এমন ব্যক্তি মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁকে ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। মন্ত্রীসভার ওপর পার্লামেন্টের সব চাইতে বড় নিয়ন্ত্রণ হল মন্ত্রীসভাকে সর্বদা নিম্নকক্ষ লোকসভার আস্থাভাজন থাকতে হয়। লোকসভার আস্থা হারালে

সরকারের পতন হয়। অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য সব বিল পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাস না হলে আইনে পরিণত হয় না। তাই লোকসভায় গরিষ্ঠতা থাকলেও অনেক সময় রাজ্যসভায় সরকারের গরিষ্ঠতা না থাকলে আইন পাসের ক্ষেত্রে সরকারকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এইভাবে মন্ত্রীসভা গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(3) **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ-** পার্লামেন্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, প্রস্তাব উত্থাপন, বিতর্ক, কোনো বিলের ওপর আলোচনা, নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে বিরোধী দল শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি পার্লামেন্টে আলোচনা, সমালোচনার মাধ্যমেও শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(4) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** অর্থবিল শুধুমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায়। কোনো বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়ে লোকসভার স্পিকারের মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। অর্থবিলের ব্যাপারে রাজ্যসভার কোনো ভূমিকা নেই। প্রথা মাফিক অর্থবিল রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় এবং ১৪ দিনের মধ্যে ফেরৎ না হলে উভয় কক্ষে তা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। নতুন কর ধার্য, পুরানো করের পুনর্বিন্যাস, কোনো করের বিলোপসাধন প্রভৃতি ব্যাপারে লোকসভা তথা পার্লামেন্টের অনুমোদন একান্ত আবশ্যিক। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত সরকার কোনরূপ অর্থব্যয় করতে পারে না।

(5) **নির্বাচন ও পদচ্যুত করার ক্ষমতা ঃ-** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের নির্বাচিত সদস্যরা ভোটদানের অধিকারী। উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন শুধুমাত্র পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের সদস্যদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতিও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য 'মহাবিচার পদ্ধতি' প্রয়োগ করে পার্লামেন্ট। এছাড়া সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, CAG প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীগণকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব পার্লামেন্টেই গৃহীত হয়।

(6) **বিচার বিষয়ক ক্ষমতা ঃ**- আইনসভার অবমাননা অথবা অধিকারভঙ্গের অভিযোগে পার্লামেন্ট সদস্য বা সদস্য নয় এমন যে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে। কোনো নিম্ন আদালতকে হাইকোর্টে উন্নীত করা, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন করা বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি কাজ ও পার্লামেন্টের এক্তিয়ারের অধীন।

(7) **সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ঃ**- নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় ছাড়া পার্লামেন্ট অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে রাজ্য বিধানসভাগুলিরও অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

(8) **জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ**- তিন ধরনের জরুরি অবস্থা যথা জাতীয় জরুরি অবস্থা, রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থাজনিত জরুরি অবস্থা এবং আর্থিক জরুরি অবস্থার মধ্যে যে কোনো ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে তা পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে অনুমোদিত হতে হয়।

(9) **জনমত গঠন ঃ**- পার্লামেন্টে কোনো বিলের ওপর আলাপ আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণ সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। বিভিন্ন মন্ত্রী ও সদস্যদের প্রশ্নোত্তর-এর মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

(10) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ**- নতুন রাজ্যগঠন বা পুনর্গঠন, রাজ্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ গঠন বা বিলোপসাধন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের অধীনে চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় ভারতের পার্লামেন্ট ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু পার্লামেন্টের এইসব ক্ষমতা ও কার্যাবলী বাস্তবায়িত হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা।

অথবা,

পার্লামেন্টে আইন পাশের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর ঃ- ভারতের সংবিধানের ১০৭-১২২ নং ধারায় আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পার্লামেন্টের মূল কাজ হল আইন প্রণয়ন করা। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক পার্লামেন্টের কোনো কক্ষে বিল উত্থাপন পর্ব থেকে পর্যায়ক্রমে বিল পাস হয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে একটি বিল আইনে পরিণত হয়।

পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে বিল উত্থাপন করা যায়। বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে অন্তত একমাস আগে নোটিশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বিল পেশ করা যায়। সরকারি বিল মন্ত্রীসভার অনুমোদন সাপেক্ষে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষে উত্থাপিত হয়।

(1) **প্রথম পর্যায় ঃ**- এই পর্যায়ে বিলটি সংশ্লিষ্ট কক্ষের চেয়ারম্যান (রাজ্যসভা) অথবা স্পিকারের (লোকসভা) অনুমতি নিয়ে সভায় পেশ করতে হয় এবং বিলের 'শিরোনাম' পাঠ করে বিলের পরিচিতি জ্ঞাত করতে হয়। এরপর বিলটি সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়।

(2) **দ্বিতীয় পর্যায় ঃ-** এই পর্যায়ে বিলের উত্থাপক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিছুদিন পরে বিল সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করে থাকেন। যেমন- বিলটি আলোচনার জন্য সভায় গ্রহণ করা হোক কিংবা বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক ইত্যাদি।

(3) **তৃতীয় পর্যায় ঃ-** বিলের এই পর্যায় হল কমিটি পর্যায়। এই পর্যায়ে বিলটিকে যদি কোনো কমিটির কাছে পাঠানো হয় তাহলে কমিটি বিলটির যাবতীয় দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে বিলের কোনো অংশের পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করতে পারে।

কারণ বিলের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন কমিটি করতে পারে না। কমিটি প্রয়োজনে বিল সম্পর্কিত বক্তব্য সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে শুনে অন্যান্য অনুসন্ধান করতে পারে এবং বিলের ব্যাপারে মতামত পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে পারে।

(4) **চতুর্থ পর্যায় ঃ-** চতুর্থ পর্যায়ে বিলের ধারা ও উপধারা নিয়ে সভায় সার্বিক আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়। যদি কোনো সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব না আনে তাহলে আলোচনা প্রতি আলোচনার শেষে বিলের প্রত্যেকটি ধারা ও উপধারা নিয়ে ভোটাভুটি হয় এবং এভাবেই বিলের দ্বিতীয় পাঠ শেষ হয়।

(5) **পঞ্চম পর্যায় ঃ-** এরপরে তৃতীয় পাঠের জন্য বিল যে কক্ষে উত্থাপিত হয়েছে সেই কক্ষে বিলটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। এই পর্বে শুধু বিলটি গ্রহণ করা হবে না প্রত্যাখান করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় বিলের সপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সমর্থন জানালে বিলটি গৃহীত হয়। গরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন না পেলে বিলটি বাতিল বলে গণ্য হয়। বিলটি গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষের চেয়ারম্যান (রাজ্যসভা হলে) বা স্পিকার (লোকসভা হলে) শংসাপত্র দিয়ে থাকেন।

(6) **ষষ্ঠ পর্যায় ঃ-** একটি কক্ষে বিলটি পাস হওয়ার পর অপর কক্ষে বিলটিকে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। সেই কক্ষেও বিলটিকে উপরোক্ত পর্যায়গুলি অতিক্রম করে আসতে হয় এবং বিলটি যদি অপর কক্ষে কোনো সংশোধনী ছাড়া গৃহীত হয় তাহলে বিলের ষষ্ঠ পর্যায় শেষ হয়। কিন্তু অপরকক্ষে বিল পাশ না হলে বিলটি আইনে পরিণত হবে না। এছাড়া অপর কক্ষ বিলটিতে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে কিংবা ছয় মাসের জন্য স্থগিত রাখতে পারে। তবে কোনো বিল অনুমোদনের ব্যাপারে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটির চূড়ান্ত মীমাংসা করেন।

(7) **সপ্তম পর্যায় ঃ-** এই পর্বে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে বিলটি আইনে পরিণত হয়। তবে রাষ্ট্রপতি বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন। তখন পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে যদি বিলটি পাস হয়ে আসে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকেন। এইভাবে সাতটি পর্যায়ে অতিক্রম করে একটি বিল আইনে পরিণত হয়।

(5) ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো।

উ: ভারতের অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিমকোর্টের সংবিধানের ১২৪-১৪৭ ধারা সমূহের মধ্যে সুপ্রিমকোর্ট সম্বন্ধে যাবতীয় আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন ঃ- সুপ্রিম কোর্ট ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৩০ জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে বলে সংবিধানে উল্লেখ আছে। বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা ২৮ জন। এছাড়া প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হতে পারে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতাগুলি হল—(1) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে (2) কমপক্ষে ৫ বছর কোনো হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কর্মরত থাকতে হবে অথবা ১০ বছর একাদিক্রমে কোনো হাইকোর্টে আইনজীবি হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচার পতির সঙ্গে পরামর্শ করেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত দুটি প্রথা হল বিচারপতিদের মধ্যে একজন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন এবং বিচারপতিদের মধ্যে প্রবীণতম বিচারপতি প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হবেন।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। সংবিধানভঙ্গ বা প্রমাণিত গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে কোনো বিচারপতিকে অপসারণ করা যায়। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ-

সুপ্রিমকোর্টের কার্যাবলী মূলত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (1) মূল এলাকা (2) আপিল এলাকা (3) পরামর্শ দান এলাকা (4) নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার এলাকা।

(1) **মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা ঃ-** সুপ্রিমকোর্ট মূল এলাকাভুক্ত যেসব বিরোধের মীমাংসা করতে পারে সেগুলি হল— (a) আইনগত অধিকারের প্রশ্নে—কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্য কয়েকটি বা একটি রাজ্য সরকারের বিরোধ দেখা দিলে, দুই বা তার বেশি রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ের সাংবিধানিক ব্যাখ্যাসহ বিরোধ নিষ্পত্তি করা। এছাড়া রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনসংক্রান্ত কোনো বিরোধ বা প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্টেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। সুপ্রিমকোর্টকে 'ভারতের সংবিধানের রক্ষাকর্তা এবং ব্যাখ্যাকর্তা বলে অভিহিত করা হয়।

(2) **আপিল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা ঃ-** দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত সুপ্রিমকোর্টের এই ক্ষমতাকে চার ভাগে আলোচনা করা যায়—

(a) **সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আপিল ঃ-** কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি কিংবা অন্য যে কোনরূপ মামলায় হাইকোর্ট যদি সার্টিফিকেট দেয় যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত কোনো বিষয় জড়িত আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে

সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত যেকোনো মামলা বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্ট নিজেই আপিল করার 'বিশেষ অনুমতি' দিতে পারে।

(b) **দেওয়ানি আপিল ঃ-** এইরূপ আপিলের ক্ষেত্রগুলি হল কোনো দেওয়ানি মামলার সঙ্গে আইনের সাধারণ প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন জড়িত থাকলে, বা কোনো দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রিমকোর্টে হওয়া উচিৎ বলে হাইকোর্ট মনে করলে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়।

(c) **ফৌজদারি আপিল ঃ-** ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের যে সব রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায় সেগুলি হল - (i) নিম্ন আদালতে নির্দোষ কোনো ব্যক্তিকে হাইকোর্ট মৃত্যুদন্ড দিলে (ii) হাইকোর্ট যদি মনে করে কোনো মামলা সুপ্রিম কোর্টে আপিল যোগ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে। এছাড়া পার্লামেন্ট আইনের প্রনয়নের মাধ্যমে ফৌজদারি বিষয়ক মামলায় সুপ্রীম কোর্টকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করতে পারে।

(d) **বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল ঃ**- সুপ্রিমকোর্ট ভারতের যে কোনো আদালতের যে কোনো রায়, আদেশ ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার 'বিশেষ অনুমতি' দিতে পারে। অবশ্য সামরিক আদালত বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপিল করা যায় না।

(3) **পরামর্শদান-সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ-** রাষ্ট্রপতি কিছু আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। যেমন - (i) আইন বা তথ্যসংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কিন্তু এক্ষেত্রে পরামর্শদান সুপ্রীমকোর্টের ইচ্ছাধীন। (ii) সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার পত্র, সনদ প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি সংবিধান চালু হওয়ার পরেও বলবৎ আছে, সেইসব বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতির অনুরোধে সুপ্রীমকোর্ট পরামর্শ দিতে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কোনো পরামর্শ গ্রহণেই বাধ্য নন।

(4) **নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারির ক্ষমতা ঃ-** সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিক স্বার্থে সংরক্ষণ করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার অধিকারী। তবে জরুরি অবস্থার সময়ে সুপ্রিমকোর্টের এই অধিকার স্থগিত থাকে।

(5) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ**- সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা রয়েছে। যথা - (i) সুপ্রিমকোর্ট অভিলেখ আদালত হিসাবে কাজ করে। (ii) সুপ্রিমকোর্ট তার নিজের দেওয়া আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে। (iii) সুপ্রিমকোর্ট তার অবমাননাকারীকে শাস্তি দিতে পারে। (iv) সুপ্রিমকোর্ট সমগ্র দেশে ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে পারে।

ভারতের সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর গভীরতা পর্যালোচনা করে একে আয়ার বলেছিলেন, ভারতের সুপ্রিমকোর্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সর্বোচ্চ আদালতের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় অত্যধিক শক্তিশালী নয় আবার ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আদালতের ন্যায় দুর্বলও নয়। তবে সুপ্রিমকোর্ট সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে পথ প্রদর্শক হলেও অতি সম্প্রতি কোর্টের কিছু রায় সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থাকায় বিচার বিভাগের আরও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ মূলক ভূমিকার কথা বিদ্বজনমহল মতপ্রকাশ করেছেন।

Part- B

1. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

$1 \times 24 = 24$

(i) 'ঠান্ডা লড়াই' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন

(a) বার্নার্ড বারুচ (b) ট্রুম্যান।

(c) চার্চিল (d) গর্বাচেভ

উ: বার্নার্ড বারুচ

(ii) বেলগ্রেড সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

(a) 1955 সালে (b) 1958 সালে

(c) 1961 সালে (d) 1965 সালে

উ: 1961 সালে

(iii) ওয়ারশ চুক্তি' গঠিত হয় কার উদ্যোগে?

(a) সোভিয়েত ইউনিয়ন (b) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(c) ব্রিটেন (d) ফ্রান্স

উ: সোভিয়েত ইউনিয়ন

(iv) ভারত-পাক 'সিমলা চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছিল কোন সালে?

(a) 1965 সালে (b) 1972 সালে

(c) 1975 সালে (d) 1978 সালে

উ: 1972 সালে

(v) সার্ক (SAARC)-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

(a) দিল্লিতে (b) ইসলামাবাদে

(c) ঢাকায় (d) কলম্বোতে

উ: ঢাকায়

(vi) পঞ্চশীল চুক্তি সাক্ষরিত হয় কোন সালে?

(a) 1950 সালে (b) 1945 সালে

(c) 1954 সালে (d) 1991 সালে

উ: 1954 সালে

(vii) UNO-র প্রথম মহাসচিব ছিলেন

(a) ইউ থান্ট (b) ট্রিগভি লি

(c) কোফি আন্নান (d) বান কি মুন

উ: ট্রিগভি লি

(viii) নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হল

(a) 10 (b) 15

(c) 20 (d) 25

উ: 15

(ix) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে নীতির সংখ্যা কয়টি ?

(a) 110 টি (b) 111 টি

(c) 112 টি (d) 113 টি

উ: 111টি

(x) সাধারণ সভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হল

(a) 190 (b) 191

(c) 192 (d) 193

উ: 193

(xi) তত্ত্বগতভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্তিত্ব রয়েছে

(a) ব্রিটেনে (b) ভারতে

(c) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (d) জাপানে

উ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

(xii) বহু পরিচালক বিশিষ্ট শাসনব্যবস্থার উদাহরণ হল

(a) সুইজারল্যান্ড (b) ফ্রান্স

(c) ভারত (d) গ্রেট ব্রিটেন

উ: সুইজারল্যান্ড

(xiii)''ন্যায়বিচারের দীপশিখাটি অন্ধকারের মধ্যে নিভে গেলে কী ভীষণ সেই অন্ধকার।'' — একথা বলেছেন

(a) মার্কস্ (b) গেটেল

(c) বার্কার (d) লর্ড ব্রাইস

উ: লর্ড ব্রাইস

(xiv)''দ্বিতীয় পরিষদ হল স্বাধীনতার অপরিহার্য নিরাপত্তা।'' — একথা বলেছেন

(a) লর্ড কার্জন (b) লর্ড অ্যাক্টন

(c) গ্রীন (d) লক

উ: লর্ড অ্যাক্টন

(xv) দ্বিকক্ষবাদ-এর সমর্থক হলেন

(a) জে. এস. মিল (b) হেগেল

(c) বার্কার (d) ফাইনার

উ: জে. এস. মিল

(xvi) ''পার্লামেন্ট হল খেলার বিষয়'' — বলেছেন

(a) বেনিটো মুসোলিনী (b) হিটলার

(c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (d) স্তালিন

উ: হিটলার

(xvii) কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নেতা হলেন

(a) উপরাষ্ট্রপতি (b) প্রধানমন্ত্রী

(c) রাষ্ট্রপতি (d) স্পীকার

উ: প্রধানমন্ত্রী

(xviii) ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন

(a) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (b) ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান

(c) ডঃ জাকির হোসেন (d) রামনাথ কোবিন্দ

উ: ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান

(xix) রাজ্যসভার সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা হল

(a) 530 (b) 250

(c) 130 (d) 552

উ: 250

(xx) রাজ্য আইনসভার উচ্চ কক্ষ হল

(a) বিধানসভা (b) বিধান পরিষদ

(c) লোকসভা (d) রাজ্যসভা

উ: বিধান পরিষদ

(xxi) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর মেয়র নির্বাচিত হন

(a) 5 বছরের জন্য (b) 6 বছরের জন্য

(c) 3 বছরের জন্য (d) 4 বছরের জন্য

উ: 5 বছরের জন্য

(xxii) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভা আহ্বান করেন

(a) পঞ্চায়েত প্রধান (b) বি.ডি.ও.

(c) সভাপতি (d) সভাধিপতি

উ: বি.ডি.ও.

(xxiii) পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হয়

(a) কাউন্সিলর (b) মেয়র

(c) সভাপতি (d) চেয়ারম্যান

উ: কাউন্সিলর

(xxiv) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ..... স্তর হল পঞ্চায়েত সমিতি।

(a) প্রথম (b) দ্বিতীয়

(c) তৃতীয় (d) চতুর্থ

উ: দ্বিতীয়

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) SEATO কথার পূর্ণ রূপ কী ?

উ: South East Asia Treaty Organization.

(ii) NAM-এর একটি নীতি উল্লেখ করো।

উ: নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন।

অথবা

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দুইজন মুখ্য প্রবক্তার নাম করো।

উ: জওহরলাল নেহরু ও মার্শাল টিটো।

(iii) দ্বিমেরুকরণ কাকে বলে ?

উ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ব দুটি মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একেই দ্বিমেরুকরণ বলে।

(iv) ভারতের বিদেশনীতির প্রধান স্তম্ভ কী ?

উ: ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জোটনিরপেক্ষতা।

অথবা

যে কোনো একটি পঞ্চশীল নীতি উল্লেখ করো।

উ: অনাক্রমণ।

(v) কয়টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে SAARC গঠিত হয়েছিল ?

উ: 1985 সালে 7টি দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছিল।

(vi) 'BRICS' কী ?

উ: Brazil, Russia, India, China ও South Africa এই রাষ্ট্রগুলির জাতীয় অর্থনীতির একটি সংঘ।

অথবা

G-77 বলতে কী বোঝো ?

উ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত বর্তমানে 134টি রাষ্ট্রের জোট। প্রতিষ্ঠার সময় 77টি রাষ্ট্র সদস্য ছিল, সেই সূত্রে নাম Group of 77 বা G-77.

(vii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্থায়ী সচিবালয় কোথায় অবস্থিত?

উ: নিউইয়র্ক (NEW YORK).

অথবা

'অতলান্তিক সনদ' কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

উ: 1942 সালে।

(viii)নিরাপত্তা পরিষদের একটি দুর্বলতা উল্লেখ করো।

উ: নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের 'ভিটো' ক্ষমতা তাদের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী করেছে এবং এভাবে সমতার নীতিটি লঙ্ঘিত হয়েছে।

(ix) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের দুটি বিশেষজ্ঞ সংস্থার নাম লেখো।

উ: (a) খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (b) আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা।

(x) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতির সংখ্যা কত?

উ: 15 জন।

(xi) 'Spirit of Laws' গ্রন্থটি কার লেখা?

উ: মন্টেস্কুর লেখা।

(xii) 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন'-এর সংজ্ঞা দাও।

উ: বর্তমানে আইনসভার কাজ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলি নির্ধারণের ভার আইনসভা শাসন বিভাগের হাতে অর্পণ করে। শাসন বিভাগ প্রণীত এরূপ আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' বলে।

অথবা

আমলাতন্ত্র বলতে কী বোঝো?

উ: প্রশাসনিক কাজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্মচারীগণ যারা রাষ্ট্রকৃত্যক নামে পরিচিত এবং শাসনবিভাগের অ-রাজনৈতিক অংশ তাঁদের পরিচালিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 'আমলাতন্ত্র' বলে।

(xiii)ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন?

উ: রাজ্যপাল পদের একটি যোগ্যতা হল তাঁকে ন্যূনতম 35 বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

অথবা

রাজ্যপাল পদের একটি যোগ্যতা লেখো।

উ: 2015 সালের xi নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(xiv)ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো দুটি ক্ষমতার উল্লেখ করো।

উ: (a) লোকসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী লোকসভার অধিবেশন কখন আহূত হবে, কতদিন চলবে, কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

(b) সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন এবং দপ্তর বণ্টন করেন।

(xv) ওয়ার্ড কমিটি কী?

উ: পৌর আইনে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড কমিটি গঠনের কথা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলার এবং অন্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়। অন্যান্য সদস্যরা কাউন্সিলার পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

অথবা

পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির আয়ের দুটি উৎস উল্লেখ করো।

উ: (a) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য (b) ঋণ গ্রহণ

(xvi)ক্ষুদ্র জেলাশাসক' কাকে বলা হয়?

উ: মহকুমা শাসক (S.D.O) কে।

অথবা

ন্যায় পঞ্চায়েত বলতে কী বোঝো?

উ: ন্যায় পঞ্চায়েত হল গ্রাম স্তরে ছোটোখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাগুলি নিষ্পত্তির জন্য গঠিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়।

Political Science

2019

PART - A (30 Marks)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ-

(1) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো।

উ: ২০১৫ সালের (i) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা

বিশ্বায়ন কাকে বলে? বিশ্বায়নের প্রকৃতি আলোচনা করো।

উ: বিশ্বায়ন কাকে বলে?— এই অংশের উত্তর ২০১৭ সালের (i) নং প্রশ্নের 'অথবা'র প্রশ্নের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য। বিশ্বায়নের প্রকৃতি আলোচনা করো এই অংশের উত্তর ২০১৫ সালের (i) এর অথবা প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশ দ্রষ্টব্য।

(2) গান্ধীজির সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত ধারনাটি আলোচনা করো।

উ: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গান্ধীজি যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সেই রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি পদ্ধতি হিসাবেই 'সত্যাগ্রহ' পরিচিত লাভ করেছে। গান্ধীজির মতে, সত্যাগ্রহ আইন হল 'ভালোবাসার আইন' এবং এরূপ আইন হল 'একটি শাশ্বত নীতি'। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত সব ক্ষেত্রেই এই নীতি কার্যকর হয়।

গান্ধীজির এই সত্যাগ্রহের উপলব্ধি এসেছিল বাইবেল, উপনিষদও শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা থেকে। এসেছিল চৈতন্য মহাপ্রভু ও মীরাবাই, বুদ্ধদেব ও মহাবীর এবং হজরত মহম্মদের চিন্তাভাবনা ও তাঁদের জীবনের নানা কার্যকলাপ থেকে। মনীষী থোরো এবং টলস্টয় এর রচনাবলী থেকেও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এভাবেই তিনি সত্যাগ্রহের ধারণাটি গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের একটি যথার্থ নামকরণের আগ্রহে তিনি বিভিন্ন নামের মধ্যে থেকে 'সত্যাগ্রহ' নামটিকেই গ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানত সত্য ও অহিংসার ওপর ভিত্তি করেই গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করে সর্বশক্তি দিয়ে অন্যায়কে অস্বীকার করাই হল সত্যাগ্রহের মূল কথা। গান্ধীজি সত্যাগ্রহীকে অধৈর্য হতে নিষেধ করেছেন। কারণ অধৈর্য হলে হিংসা আসতে পারে। তাঁর মতে প্রতিপক্ষের মনে ন্যায়বোধ জাগিয়ে তুলে তার হৃদয় জয় করাই হল সত্যাগ্রহের মূলকথা।

গান্ধীজি সত্যাগ্রহের তিনটি দিকের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন ঃ-

(1) **সত্য ঃ-** গান্ধীজি সত্যকেই ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করতেন এবং সেই সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য অহিংসা নীতির কথা বলেছিলেন।

(2) **অহিংসা ঃ-** গান্ধীজির রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল অহিংসা। সত্যের সন্ধান করতে গিয়েই তিনি অংহিংসার সন্ধান পান। অহিংসার গণভিত্তি তৈরি হয়েছিল সত্যাগ্রহের মাধ্যমে। তাঁর মতে একজন সত্যাগ্রহী সবসময় হিংসাকে পরিত্যাগ করে চলবে। একজন সত্যাগ্রহী সত্য তথা ঈশ্বর লাভের জন্য হিংসা পরিত্যাগ করে চলবেন।

(3) **আত্মনিগ্রহ ঃ-** গান্ধীজির মতে আত্মপীড়নই হল তপস্যা। আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়েই সাহস সঞ্চয় করতে হবে। কারণ আত্মনিগ্রহের মাধ্যমেই সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করতে পারবেন। তাই আত্মনিগ্রহ ও হিংসাকে গান্ধীজি পরস্পর বিরোধী বলে মনে করতেন।

সত্যাগ্রহের বিভিন্ন রূপ ঃ-

গান্ধীজি সত্যাগ্রহের জন্য সত্যাগ্রহীকে দুঃখবরণ করতে এমন কি প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে অবিশ্বাস করবে না এবং সত্যাগ্রহ চলাকালীন কোনো রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবেনা।

(1) **অসহযোগ ঃ-** অসহযোগ আন্দোলনকে গান্ধীজি একটি শক্তিশালী ও সঠিক পথ হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। তাঁর মতে, অসহযোগ দৈহিক প্রতিরোধ বা হিংসার থেকেও অনেক বেশি সক্রিয়। গান্ধীজির মতে জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতির ওপর যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে থাকে। জনসাধারণ সম্মতি প্রত্যাহার করলে রাষ্ট্রের পক্ষে কার্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(2) **আইন অমান্য ঃ-** সত্যাগ্রহীরা স্বইচ্ছায় রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করে চলে। কিন্তু যদি কোনো অনৈতিক আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে তাকে অমান্য করার অধিকার সত্যাগ্রহীদের রয়েছে। গান্ধীজি আইন অমান্যকে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক এই দু-ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন নিজের অধিকার রক্ষার জন্য আক্রমণাত্মক আইন অমান্য করা আর মনুষ্যত্ব বিরোধী খারাপ আইনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক আইন অমান্য করার কথা বলেছেন।

(3) **অনশন ঃ-** গান্ধীজি সত্যাগ্রহের জন্য সর্বশেষ পদ্ধতি হিসাবে 'অনশন'কে বেছে নিয়েছেন। অনশনের ইতিবাচক দিক হিসাবে তিনি বলেছেন যে, অনশন হল একটি আত্মিক কর্মোদ্যোগ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যার প্রভাব জাতীয় জনজীবনে গভীর রেখাপাত করবে।

(4) **পিকেটিং ঃ-** সত্যাগ্রহের অন্যান্য পথের মতো এই দিকটিও হবে অহিংস। পিকেটিং—এর ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রনী ভূমিকা নেওয়ার জন্য গান্ধীজি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

(5) **অন্যান্য পদ্ধতি ঃ-** এছাড়া গান্ধীজি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা, আবেদন নিবেদন, সক্রিয় প্রচারমূলক সভা সমিতি ও মিছিল প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণের কথাও বলেছেন।

গান্ধীজি সত্যাগ্রহীদের জন্য কিছু আচরণ বিধির কথাও বলেছেন। যথা— সত্যাগ্রহী কখোনো ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। সত্যাগ্রহের সময় রাষ্ট্রশক্তির প্রহার সহ্য করতে হবে। আইন অমান্যকালে গ্রেপ্তার বরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রভৃতি।

বন্দী অবস্থায় আইন অমান্যকারী জেলের কর্মচারীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবেন। জেলের মধ্যে সমস্ত কয়েদিদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বোধ রাখা চলবে না প্রভৃতি।

এছাড়া সত্যাগ্রহীকে ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা অগ্রাহ্য করে দলনেতার নির্দেশ পালন করতে হবে। দলের মধ্যে থাকাকালীন সর্বদা দলের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় সত্যাগ্রহী কোনোভাবেই কোনো বিরোধের মধ্যে থাকবেন না। কিন্তু যে পক্ষ ন্যায়ের পথে থাকবে সেইপক্ষকে সাহায্য করবেন। নিজেকে ধর্মীয় পরিচিতির উর্দ্ধে রেখে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসায় সহযোগিতা করবেন।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ তত্ত্বটিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। অনেকে এই সত্যাগ্রহকে মানুষের মধ্যে অবাস্তব এক বিভ্রান্তির পরিস্থিতির কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

এতদ্‌সত্ত্বে ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গান্ধীজির নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যদের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলন গন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

(3) এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

উ: ২০১৬ সালের (iii) নং 'অথবা' প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলতে কী বোঝো? ''কঠোর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়''—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

উ: ২০১৫ সালের (iii) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(4) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।

উ: ২০১৭ সালের (iv) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা

ভারতের অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতাগুলি ব্যাখ্যা করো।

উ: ২০১৬ সালের (iv) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(5) ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করো।

উ: ২০১৭ সালের (v) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

Part- B

1. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ডানদিকে নীচে প্রদত্ত বাক্সে লেখো : $1 \times 24 = 24$

(i) ঠান্ডা যুদ্ধকে 'গরম শান্তি' বলে বর্ণনা করেছেন

(a) ফ্রিডম্যান (b) রেমন্ড

(c) ফ্র্যাঙ্কেল (d) বার্নেট

উ: ফ্রিডম্যান

(ii) ন্যাটো (NATO) গঠিত হয়

(a) 1943, 4th April (b) 1944, 4th April

(c) 1945, 4th April (d) 1949, 4th April

উ: 1949, 4th April

(iii) ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান হয়

(a) 1980 সালে (b) 1995 সালে

(c) 1991 সালে (d) 1993 সালে

উ: 1991 সালে

(iv) '123' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল

(a) 2005 সালে (b) 2007 সালে

(c) 2009 সালে (d) 2011 সালে

উ: 2007 সালে

(v) ১৯৯১ সালে ভারতে ..... -এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালীন সময়ে বাজার-অর্থনীতির সূত্রপাত ঘটে।

(a) ইন্দিরা গান্ধি (b) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী

(c) নরসিমা রাও (d) মনমোহন সিং

উ: নরসিমা রাও

(vi) ভারত-চীন সীমানা বিরোধ হয়

(a) 1962 সালে (b) 1967 সালে

(c) 1960 সালে (d) 2017 সালে

উ: 1962 সালে

(vii) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়

(a) 1944 (b) 1945

(c)1948 (d) 2000

উ: 1945

(viii)'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' সাধারণ সভায় গৃহীত হয়

(a) 1960 সালে (b) 1970 সালে

(c) 1950 সালে (d) 1965 সালে

উ: 1950 সালে

(ix) আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতিদের কার্যকাল

(a) 9 বছর (b) 7 বছর

(c) 5 বছর (d) 2 বছর

উ: 9 বছর

(x) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের কার্যকাল

(a) 2 বছর (b) 3 বছর

(c) 4 বছর (d) 5 বছর

উ: 2 বছর

(xi) ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন

(a) ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ (b) ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান।

(c) ডঃ জাকির হোসেন (d) কোনোটিই নয়

উ: ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

(xii) রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন

(a) রাষ্ট্রপতি (b) উপরাষ্ট্রপতি

(c) স্পিকার (d) প্রধানমন্ত্রী

উ: উপরাষ্ট্রপতি

(xiii)পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন

(a) প্রধানমন্ত্রী (b) উপরাষ্ট্রপতি

(c) স্পিকার (d) রাজ্যপাল

উ: স্পিকার

(xiv)অর্থবিল প্রথম উপস্থিত হয়

(a) লোকসভায় (b) রাজ্যসভায়

(c) বিধান পরিষদে (d) সুপ্রিম কোর্টে

উ: লোকসভায়

(xv) ''ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পৃথিবীর যে কোনো সুপ্রিম কোর্ট অপেক্ষা শক্তিশালী'' — কে বলেছেন —

(a) এ. কে. আয়ার (b) পি. এন. ভগবতী

(c) ডি. ডি. বসু (d) ডঃ বি. আর. আম্বেদকর

উ: এ. কে. আয়ার

(xvi)হাইকোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স হল

(a) 65 বছর (b) 60 বছর

(c) 62 বছর (d) 70 বছর

উ: 62 বছর

(xvii) ক্রেতা সুরক্ষা আইন তৈরি হয়

(a) 1985 সালে (b) 1987 সালে

(c) 1986 সালে (d) 1988 সালে

উ: 1986 সালে

(xviii) সুপ্রিম কোর্টের আছে

(a) মূল এলাকা (b) আপীল এলাকা

(c) পরামর্শদান এলাকা (d) মূল, আপীল ও পরামর্শদান এলাকা

উ: মূল, আপীল ও পরামর্শদান এলাকা

(xix) পশ্চিমবঙ্গে প্রথম লোক আদালত গঠিত হয়

(a) 1986 সালে (b) 1987 সালে

(c) 2003 সালে (d) 2005 সালে

উ: 1987 সালে

(xx) কোন ধারাবলে হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষায় লেখ জারি করে?

(a) 32 নং ধারা (b) 226 নং ধারা

(c) 51 নং ধারা (d) 326 নং ধারা

উ: 226 নং ধারা

(xxi) পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়

(a) 1975 সালে (b) 1977 সালে

(c) 1978 সালে (d) 1980 সালে

উ: 1978 সালে

(xxii) পঞ্চায়েত সমিতির সভা কে পরিচালনা করেন?

(a) প্রধান (b) সভাপতি

(c) সভাধিপতি (d) বি.ডি.ও.

উ: সভাপতি

(xxiii) কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা হল

(a) 144 (b) 162

(c) 135 (d) 152

উ: 144

(xxiv) ছোটো শহরগুলির স্বায়ত্তশাসন পরিচালিত হয়

(a) গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বারা (b) পৌরসভার দ্বারা

(c) রাজ্য সরকার দ্বারা (d) গ্রামসভার দ্বারা।

উ: পৌরসভার দ্বারা

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : 16 × 1 = 16

(i) কোন সম্মেলনকে ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ?

উ: 1955 সালের 18 জুলাই জেনেভা সম্মেলনকে।

অথবা

ট্রম্যান নীতি কাকে বলে ?

উ: ১৯৪৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গ্রিস ও তুরস্কের কমিউনিস্টদের এবং ওই দুই দেশে সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব চূড়ান্তভাবে খর্ব করার যেসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন তাকেই ট্রুম্যান নীতি বলে।

(ii) দাঁতাত ও ঠান্ডা লড়াইয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী ?

উ: ২০১৬ সালের i) নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(iii) 'পেরেস্ত্রৈকা' কী ?

উ: ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম অধিবেশনে ''গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা'' নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। পেরেস্ত্রৈকা বলতে বোঝায় পুনর্গঠন অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন বা সংস্কার সাধন।

(iv) ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী 1987 সালে শ্রীলঙ্কা সরকারের সাথে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে চুক্তি করেন ?

উ: রাজীব গান্ধী

(v) কোন বছর বান্দুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ?

উ: 1955 খ্রিঃ

(vi) সার্কের সদস্য দেশগুলির নাম উল্লেখ করো।

উ: ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

অথবা

SAPTA-র পূর্ণ রূপ কী ?

উ: South Asian Preferential Trade Arrangement.

(vii) নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে এমন দুটি রাষ্ট্রের নাম করো।

উ: ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

অথবা

জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) মোট সদস্য সংখ্যা কত?

উ: 54

(viii) আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোথায় অবস্থিত?

উ: নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে।

(ix) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দিবস রূপে বছরের কোন দিনটি পালিত হয়?

উ: 24 অক্টোবর

অথবা

জাতিপুঞ্জের 193 তম সদস্য রাষ্ট্রটির নাম কী?

উ: South Sudan (দক্ষিণ সুদান)

(x) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের যে-কোনো একটি নীতির উল্লেখ করো।

উ: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব রাষ্ট্রই সমান।

(xi) ভারতের রাষ্ট্রপতি কোন পদ্ধতিতে পদচ্যুত হন?

উ: ভারতের রাষ্ট্রপতিকে 'ইমপিচ্‌মেন্ট' পদ্ধতি (61 নং ধারা)-র মাধ্যমে পদচ্যুত করা যায়।

(xii) 'সম-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' বলে কাকে অভিহিত করা হয়?

উ: প্রধানমন্ত্রীকে

অথবা

রাজ্যের বিধানসভার নেতা বা নেত্রী কে?

উ: মুখ্যমন্ত্রী

(xiii) বিচার বিভাগীয় অতি সক্রিয়তা বলতে কী বোঝো?

উ: 2017 সালের xiv নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অথবা

'পরমাদেশ' কথার অর্থ কী?

উ: পরমাদেশ কথার অর্থ 'আমরা আদেশ দিচ্ছি'। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য পরমাদেশ জারি করতে পারে।

(xiv) লোক আদালত কোথায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

উ: গুজরাটে

(xv) 1992 সালের কোন সংবিধান সংশোধনী আইন গ্রামীণ স্থায়ত্তশাসনের সঙ্গে জড়িত?

উ: 73 তম সংবিধান সংশোধন আইন।

অথবা

সপারিষদ মেয়রের মোট সদস্যসংখ্যা কত?

উ: 10 জন

(xvi) জেলা পরিষদের আয়ের দুটি উৎসের উল্লেখ করো।

উ: (a) জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত পথকর ও পূর্তকর

(b) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দান ও অনুদান।

অথবা

পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য কত আসন সংরক্ষিত থাকে?

উ: পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য 50% আসন সংরক্ষিত থাকে।

Price : ₹ 40/- only

Printed at Saraswaty Press Ltd.